বন্ধন ও মুক্তি

শ্রীমতিলাল দাশ

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সাহিত্যিক বন্ধু

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর

করকমলে।

ফাল্গুন

১৩৪৭

সূচী

বন্ধন ও মুক্তি

সাহিত্যিক হইবার দুরাশা রমেনের আজন্ম-পোষিত বাসনা। এম্-এ পরীক্ষা দিয়া যখন অবসর-ঘন দিনগুলি চলিতে চায় না, তখন রমেন সংকল্প করিল, সে দেশ-মাতৃকার পরিচয় লইবে। বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে চলিল বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য রঘুয়া, কবিতার খাতা অনামিকা, আর কোডাক্ ক্যামেরা। রাজপুর গ্রাম, পদ্মার চরে, সেখানে আসিয়া বাসা বাঁধিল। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে আম্রের মুকুলোদ্গত শাখে কোকিলের কুহুরব ওঠে, রমেন কবিতা লেখে।

হে আমার! হে চির-অপরিচিতা!
বসন্তে শরতে নিত্য যুগে যুগে রচিলাম, তোমারি বন্দনা-গীতা
অয়ি অনিন্দিতা!

ফাল্গুনের মধুর দ্বিপ্রহরের দক্ষিণ-পবন মেদুর অপরাহ্ণে গড়াইয়া পড়ে। কাল বৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব রাজে—ঝড়ের দোলায় কবির চোখে ধূলি আসিয়া পড়ে। কিন্তু ধূলির সাথে সাথে আসিল তরুণী ইরা। রূপ-লাবণ্যে অনুপমা ভাস্বর-দ্যুতি শুকতারার মত দীপ্তিময়ী; বিস্ময়ের চমক এবং বার্ত্তা তার চোখে মুখে ঝলসিয়া ওঠে।

অপরিচিতা তরুণীর সহিত আলাপ পরিচয় সে জীবনে করে নাই—কাব্য-পড়া সমস্ত সম্বোধনগুলি তার কণ্ঠে বাধিয়া যায়। লজ্জা সঙ্কোচ এড়াইয়া বাধ-বাধ ভাবে সে বলিল, "বসুন"।

প্রথম আলাপের জড়তা কাটিল। কালবৈশাখীর নর্ত্তন চলে—উন্মাদ আলোড়ন! রুদ্রের ক্রোধ-বহ্নি যেন আজ প্রজ্জ্বলিত! রমেনের তৃণ-গৃহ আশঙ্কায় আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে!

"কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"ও আমি!" অন্যমনস্ক তরুণী বাহিরের ঝড়ের দোলা দেখিতেছিল—মন তার শঙ্কা-কাতর। রমেনের প্রশ্নে সচকিত হইয়া উত্তর দেয়—

"আমি পদ্মা দেখতে বেরিয়েছিলুম—কলকাতা সহরের দেওয়াল-ঘেরা ঘরে মন আটকে ওঠে—দেখতে বেরিয়েছিলুম—বাংলামায়ের সৌন্দর্য্য! ছায়াশীতল নদীতীরে তাঁর শ্যামল আঁচলের মায়া—" ঝড়ের ঝটকা কথা থামাইয়া দেয়—

ছোট একখানি ঘর—সম্মুখে ছোট বারান্দা, পাশে রান্নার জন্য একটী চালা—রুদ্রের আক্রোশ থামিল, কিন্তু ছোট ঘরখানিকে ভাঙ্গিয়া। রমেন ও ইরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঝঞ্ঝার তাণ্ডব শেষে আকাশে মেঘের লীলা চলে—নীচে রমেন ও ইরা। রঘুয়া ভগ্ন গৃহ হইতে জিনিষ-পত্র বাহির করিতে গিয়াছে—পাশে পদ্মার বিস্তৃত চর।

ইরা বলিল, "এখন কি করবেন? চলুন, আমার নৌকোয় কলকাতায় যাবেন।"

অপরিচিতার আহ্বান! সঙ্কোচ ও ইচ্ছার দ্বন্দ্ব চলে—ইচ্ছাই জয়-লাভ করে।

রমেন জিজ্ঞাসা করে—"আপনি ত খুব সাহসী, একা একা বেরিয়ে পড়ছেন।"

ইরা বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসিতে মুগ্ধ করিয়া বলে, "ঘরের আড়ালকে আমি মানিনে।"

রঘুয়া জিনিষ-পত্র আনিয়া বজ্‌রা ভরে। রমেন ইরার সহিত কলিকাতায় চলিল। পিছনে আকর্ষণ ছিল যত, সম্মুখ তার চেয়ে অনেক আনন্দের প্রলোভন দেখায়, রমেন তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিল না—রমেনের অবস্থায় বোধ হয় কেহই পারেন না।

পদ্মা বাহিয়া নৌকা চলে।

নানা দেশ, নানা ছবি। রমেন ও ইরা কৌতুক-মুগ্ধ হৃদয়ে বজ্‌রার ছাদে বসিয়া দেখে, হাসে ও গল্প করে। মাঝে মাঝে ইরার ছবি তোলে।

অপরিচয়ের আড়ষ্ট-ভাব কাটিয়াছে—।

রমেন বলিল—"কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?

ইরা ভাসমান বৃক্ষ'পরে উপবিষ্টমান গাং-শালিকের খেলা দেখিতেছিল, ফিরিয়া বলিল—"তার প্রয়োজন কি? পথের পরিচয় পথেই শেষ হবে, তার চেয়ে হৃদ্যতার দাবি আমার নেই।"

রমেন বিস্ময় অনুভব করে!

শিক্ষিতা তরুণী, কিন্তু তার মাঝে এ কি রহস্য-জাল! ইরা আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়, একি বিনয়—না আর কিছু!

রমেন ভাবিয়া পায় না—বসিয়া বসিয়া ভাবে, আর মাঝে মাঝে অনল-দ্যুতি-ভরা ইরার লাবণ্য-ললিত-মুখে অপাঙ্গে চাহিয়া লয়। মকর-কেতনের পুষ্পশর অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে, কেহই তাহা লক্ষ্য করে না।

রমেন হৃদয়ের আকুতি জানাইতে চাহে।

বলে—"ইরা, পড়া শেষ হলে তুমি কি করবে?"

"জানি না, হয় মাষ্টারি করব, না হয় নার্শ হব।

"না না, সে কেন করবে—তুমি যার ঘরে যাবে, সে ঘর আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে হাস্তে, গানে, দীপ্তিতে, মেধায়···

"কিন্তু ঘর-গড়াই ত সকলের কাম্য নয়—"

"এসব তোমার মনের কথা নয়! যতই বল আদিম যুগ থেকে মানুষ ঘরই বেঁধেছে, ঘর না বাঁধলে আজকের এই চমৎকার বিশ্ব-সভ্যতা, কোথায় ভেসে যেত কে জানে?"

"বিশ্বের ভাবনা ভাবতে পারি এত বড় মনীষা আমার নেই—"

রমেন তর্ক করে না, নীরব হইয়া নদীর শোভা দেখে।

ইরা বোঝে, রমেনের রাগ হইয়াছে। হাসিতে হাসিতে বলে—"রাগ করলেন?"

"না কার ওপরে রাগ করব?"

"ওঃ তাই বলুন, রাগ করবার লোক চাই আপনার!"

রমেন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে—আপনার দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া লজ্জা হয় কিন্তু হাসি লজ্জাকে ছাপাইয়া ওঠে।

"এই জন্তেই ত ঘর বাঁধতে চাইনে, আপনারা ত' আমাদের আসল মূল্য দিতে চান না?"

"তার মানে?"

"অস্পষ্টতা কিছু নেই এর মধ্যে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন পাশা খেলায়, তার কারণ, তাঁর ধারণায় দ্রৌপদী তাঁর সামগ্রী। কথাটা রূঢ় শোনাচ্ছে, অত্যুক্তি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মোটেই নয়, এটা একেবারে নিছক সত্যি কথা।"

ইরা যখন আগ্রহে বক্তৃতা করে, তখন তাহাকে মানায় ভাল। রমেন তস্করের মত সেই রূপসুধা পান করে। ইরার কথা থামিলে বিভ্রান্ত ভাবে বলে—"এ আমি মানিনে—"

"মানেন না মুখে, মনে মনে বেশ মানেন, পত্নীকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য না পেলে কিছুতেই মন শান্ত হয় না।"

"এসব তোমার বই-পড়া কথা, জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার নেই। আমদের দেশে নরনারীর মাঝে যে সুমধুর দাম্পত্যপ্রেম, তার তুলনা নেই।

"এ বক্তৃতা আপনার মুখেই সাজে, কারণ আপনি বিয়ে করেন নি—"

রমেন অপ্রতিভ হইয়া যায়—তবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলে,—"বিয়ে করি নি বটে, কিন্তু যারা করেছে তাদের ত দেখেছি।"

"যা দেখেছেন, প্রাণহীন জড়ের স্বস্তি, সে একটা আবেগহীন মরণের মত শান্তি—"

"তাঁর মানে ?"

"কারণ আমাদের দেশে প্রেম জীবন্ত নয়, নারীকে মানুষ জয় করে নেয় না—তাই যে ভালবাসা গড়ে ওঠে, সে শুধু নৈকট্যের আকর্ষণ—সে প্রেম সবল নয়, জীবন্ত নয়।"

রমেন চুপ করিয়া ভাবে, এ কি কোনও ইঙ্গিত ? এই বিদ্যুৎ-জ্বালাময়ী নারী যে প্রেম নিবেদন চাহে, সে কি তাহা দিতে পারিতেছে না ? কাব্যের সঙ্গে জীবনের এতটুক সঙ্গতি নাই—বই-পড়া বুলি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

সে ধীর সংযত-কণ্ঠে বলিল,—"তা হয়ত সত্য, আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতি হয়ত তার জন্য দায়ী, কিন্তু সে বিবাহ কল্যাণে গড়া, তা শত-শতাব্দীর ভারতীয় শীলতা জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"সে প্রেম মানুষকে বড় করে তোলে নি—মানুষকে গৃহের ক্ষুদ্র আয়তনে ক্ষুদ্র করেই রেখেছে—"

সেদিন কথা আর অধিক চলিল না—রঘুয়া আসিয়া আহারের বার্ত্তা জানাইল। ক্ষুধার আহ্বান তর্ককে জয় করিল না, কারণ তার্কিকের একজন নারী। ইরা বলিল,—"যাক্ এখন খেতে চলুন।"

ভাগিরথীর কূলে ছায়া-শ্যামল একটি গ্রামের হাটে মাঝিরা রাত্রির জন্য নৌকা বাঁধিয়াছিল।

অনুকূল স্রোতের বিলম্ব আছে বলিয়া রমেন গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। পথে বন্যফুলের তোড়া গাঁথিয়া ফিরিতেছিল, শুনিল নৌকায় গান চলিয়াছে। মনে করিল—ইরা গাহিতেছে। অগ্রসর হইতে বুঝিল বৈরাগীরা খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে।

ভক্ত ও ভাবুক চিত্তে রাধাকৃষ্ণের গানের মহিমা অনন্ত, সে গানের ফোয়ারা তাই অফুরন্ত চলে। বৈরাগী গাহিতেছিল,

"সে কালার প্রেম করা, কথার কথা নয়,
ভাল হ'লে ভালই ভাল, নইলে ল্যাঠা হয়।
সামান্যে কি এ-জগতে পারে কি কেউ প্রেম যজিতে
প্রেমী নাম বাড়ায়ে মিছে, দু'কূল হারায়।
এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার, প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার,
ভাব জেনে ভাব না দিলে তার, প্রেমে কি কূল পায়?
গোপী যেমন প্রেম আচারী যাতে রাধা বংশীধারী
লালন বলে, সে প্রেমেরি ধন্য জগৎময়।

তন্ময় হইয়া রমেন গান শুনিতেছিল। ফিরিতেই ইরা বলিল,—"গান শুনলেন?" "শুনেছি, প্রেম-সাধনা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-সাধনা, অথচ আপনি বলছিলেন আমাদের দেশে প্রেম নেই।"

ইরা তাহার আয়ত কৃষ্ণ দীপ্ত চক্ষু মেলিয়া রমেনের মুখের দিকে চাহিল, পরে চিত্তবিভ্রমকর কটাক্ষ হানিয়া কহিল,—"কিন্তু এ-প্রেম আপনার সমাজে অচল, রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম গাঁট-ছড়ার মাঝে হয় নি।"

"তা ঠিক, এই প্রেমকে আমরা আধ্যাত্মিক চোখে দেখি।"

"আপনাদের আধ্যাত্মিকতা রাখুন, কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন সাহসী, দুর্দ্দম, তাই তিনি রাধার চিত্ত জয় করেছিলেন। সত্যকার প্রেম এমনই প্রাণবন্ত, সে হৃদয়কে জয় করে। তরুণ বীরধর্ম্মী, নারীকে সে জয় করে চলে।

তর্কস্থলে রঘুয়া আসিল, মৌন মিনতিপূর্ণ ভঙ্গীতে কহিল,—'হুজুর'।"

ইরা বলিল,—"আপনার খাওয়া হয় নি, চলুন চা করে দিই।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া রমেন বলিল,—"কলকাতায় আজ সন্ধ্যায় বোধ হয় পৌছব, কিন্তু একটা কথা—"

রমেন কথা শেষ করিল না, মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ইরার নিকট উৎসাহের সাড়া পাইবার উদ্দেশ্যে করুণ দৃষ্টিতে ইরার মুখের পানে চাহিল।

ইরা বলিল,—"বলুন।"

'হয়ত অন্যায় হচ্ছে, স্বল্প পরিচয়ের সুযোগকে আমি হয়ত—আমি হয়ত—' রমেনের মুখে কথা বাধিয়া যায়।

ইরা হাসিতে আরম্ভ করে। চপল, লঘু, স্বচ্ছন্দ হাসি—অনাবিল হাস্যের ফুলঝুরি ঝরিয়া চারিদিক যেন জীবন্ত করিয়া তোলে। হাসি থামিলে বলে, "গৌরের দেশে এসেছেন বলে, বুঝি, গৌর-চন্দ্রিকায় জোর দিচ্ছেন খুব—"

"তা নয়! তা নয়! তবে?"

"তবে কি ?"

"আপনি যদি অসঙ্গত মনে করেন, যদি ভাবেন ঔদ্ধত্য, তাই ভয় হয়—"

"না, না, আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে বলুন, ভয় করব না শুনতে, আর শুনে রাগও করব না।"

"আমি হয়ত আপনার যোগ্য নই, কিন্তু এ কয়দিনে আপনাকে যেমন নিবিড়ভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছে, এমন আর কারও সঙ্গে হয় নি।"

"কাজেই আমি আপনার গৃহে যাই এই কথা ত ?"

রমেন কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পায় না। ইরা প্রগল্‌ভা, তাহার সঙ্গে সে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, একেবারে চুপ হইয়া যায়।

ভাগিরথার জলে কল্লোল চলে—তরঙ্গের লক্ষ নর্ত্তন। হু'টি তরুণ ও তরুণীর হৃদয়েরও ভাবের তরঙ্গ চলে !

ইরা খানিক পরে বলে, "চা-টা শেষ করে ফেলুন, রাগ করে ওকে পরিত্যাগ করলে লাভ কিছুই নেই।"

রমেন বলে, "আমি হয়ত তেমন ক'রে কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এ কথা আমার আন্তরিক জানবেন যে, আমি আপনাকে ভালবেসেছি।"

"কিন্তু ভালবাসা আমাদের দেশে চলে না জানেন ?" রমেন অবাক্ হইয়া বিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহে। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। ইরা বলে, "অবাক্ হচ্ছেন কেন ? আমি ত খুব সোজা কথায় বলছি।"

"কেন চলবে না ?"

আমাদের দেশের বিয়েতে হৃদয়ের কোনও স্থান নেই—এ-দেশের বিয়ে প্রেমহীন, প্রাণহীন···

"না, না এ অন্যায় বলছেন, এ সত্য নয়।"

"সত্য, কিন্তু আমাকে আপনি জানেন না, আমার পরিচয় জানেন না, আমার কুলজী জানেন না, আমাকে আপনি ভালবেসে ফেললেন কি করে?"

রমেন এত কথা ভাবে নাই। কবির মত সে সংসার জ্ঞানহীন, সংসারকে সে শুধু ভাবের চোখে দেখিয়াছে, বস্তু-জগতের ও রস-জগতের কোথায় যে সীমারেখা তাহার সন্ধান কোন দিনই করে নাই।

এই অপরিচিতা তরুণীর চঞ্চল চারু কথার সাবলীল ভঙ্গী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার দীপ্ত রূপশিখা তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে কিন্তু হৃদয়ের সাথে বুদ্ধির যোগ নাই, তাই দিনে দিনে সাহচর্য্যে যে প্রীতি জাগিয়াছে, তাহাকে সে যাচাই করিয়া লইবার ভাবনাই ভাবে নাই।

ইরার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিল, "শকুন্তলার কথাই আমার মনে জাগছে, দুষ্মন্তের মত আমার মন বলছে 'তুমি আমার— একান্তই আমার···"

"থাক্, হয়েছে পাগলামি করবেন না—" এই বলিয়া বিদ্যুৎবেগে ইরা চলিয়া গেল। রমেন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

ইরা একটি রহস্য। মরুদেশের মরীচিকার মত সে নয়ন ধাঁধায় কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না।

সেদিন সারাদিন আর ইরা রমেনকে দেখা দিল না। আপনার কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া বই নিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বজরা ঘাটে ভিড়িল, ইরা বাহির হইয়া রমেনকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন?"

রমেন চাহিয়া চাহিয়া কলিকাতার জনতা ও কোলাহল দেখিতেছিল, ফিরিয়া বলিল,—"অপরাধ আপনার নয়, অপরাধ ত আমিই করেছি।"

"তর্ক করে লাভ নেই, আপনার হৃদয় কোমল, আপনি ব্যথা পেয়েছেন!"

"সংসারে থাকলে মাঝে মাঝে ব্যথা লাগে, তার জন্যে দুর্ভাবনা করে লাভ নেই।"

রঘুয়া আসিয়া জানাইল, ট্যাক্সি ঠিক করিয়াছে, রমেন বলিল,—"আপনার জিনিষপত্র আগে উঠিয়ে দিন···"

"সেজন্য ভাবতে হবে না, আমার ঝি পাকা লোক, ও সব ঠিক করে নেবে।"

রমেন রঘুয়াকে বলিল,—"যা, সব জিনিষ-পত্র তোলা হলে আসবি।"

ইরা বলিল,—"এতদিন ধরে মেয়েরা ভেবেছে, নীড় বেঁধে শাবক পালন করাই তার চরম সার্থকতা কিন্তু একথা আমরা মানতে চাই নে, আমরা পরখ করে দেখতে চাই, জীবনকে তার নানা বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে—"

"আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক্।"

ইরা হাসিতে হাসিতে বলে, "তবু অভিমান?"

"অভিমান করব কেন?"

"কারণ এতদিন ধরে অভিমান করে এসেছেন, নারীকে চেয়ে এসেছেন দাসীরূপে—তাই তার অবাধ্যতা কিছুতেই আপনাদের ধাতে সয় না।"

বুদ্ধিমতী ইরার বাক্যবাণ তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার মত হৃদয়কে বেঁধে, রমেন বলে,—"কিন্তু নারীকে যে পূজা সে দিয়েছে—"

"সে অন্ধ স্তাবকতা, বশীকরণের মন্ত্র। সে সত্য নয়—"

"যাক্, আমার বোকামিকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার বাসার ঠিকানাটা—"

"না—তার প্রয়োজন কি, আমাদের পরিচয় পথে হয়েছিল—পথেই তার সমাপ্তি হোক্—আমরা তার জের টেনে নিতে চাইনে—"

"কিন্তু কোন আশাই কি করব না ইরা ?"

চলিতে চলিতে ইরা উত্তর দিল—"যা ভাল লাগে, তাকে সব সময়ে সংসারে পাওয়া যায় না—তাই তার আশা সব সময়ে না করাই ভাল—"

রমেন উষ্ণ হইয়া বলিল,—"আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই নি।"

ইরা রমেনের কাতর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহে, পরে ধীরে ধীরে বলে, "আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে—আপনার বন্ধুত্ব পেয়েছি, ওইটাই আমার খুব দামী পাওয়া, কিন্তু প্রতিদিনের মাঝে তাকে হারাতে আমি চাই নে—"

"তোমার কথা যে শুধু হেঁয়ালি হয়েই দাঁড়ায়।"

"হয়, তার কারণ আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা[illegible]

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ট্যাক্সির কাছে আসি[illegible], রমেন ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল,—"নমস্কার, কিন্তু ঠিকানা[illegible]।"

ইরা রমেনকে বলিল—"বালীগঞ্জে, কিন্তু আমার খোঁজ করবেন না, আপনি জীবনে সুখী হ'ন, নমস্কার।" ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

ফিরিতেই মা বলিলেন "ভালই হল, তোকে চিঠি দেব ভাবছিলাম, শ্যামপুরের গোঁসাইরা এখন খুব জরুরী তাড়া দিচ্ছে—" রমেনের মুখে উৎসাহের জ্যোতি খেলে না। পরিণয়ের পুলকোচ্ছ্বাস তাহাকে আপ্লুত করে না।

'তা হ'লে তোর যাওয়াই দরকার—পরিচিতার সঙ্গে এই অপরিচিতার তুলনা করে নিতে পারবি।'

বরেনের হাত এড়াইতে না পারিয়া রমেন থিয়েটারে গেল।

থিয়েটারে অভিনয় রমেন কখন দেখে নাই!

সেদিন যথেষ্ট ভিড়। পুস্তকখানি চমকপ্রদ আর সর্ব্বোপরি ইরা দেবীর নাম দর্শকদের জনতা জমাইয়াছে।

রমেনের মন চঞ্চল হইয়া প্রতীক্ষায় রহে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নায়িকাবেশে ইরার আবির্ভাব।

নায়িকা স্বামীকে বলছে—"আমায় ছেড়ে দাও, আমি মুক্তি চাই।"

রমেনের মন কথোপকথনের মধ্যে রহিল না—সে ইরার পানে চাহিয়া রহিল। চঞ্চলা, রূপময়ী—দীপ্তিময়ী ইরার অভিনয় বিপুল জনসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একবার যবনিকা পড়িলে বরেন রমেনকে আইসক্রিম খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল—"ভদ্র মেয়েরা থিয়েটারে এলে থিয়েটারের অভিনয়-নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু আসাই মুস্কিল, আর—রঙ্গজগতে চরিত্র রাখাই দায়, শুনছি এই মেয়েটি জীবেশ সান্ন্যালের রক্ষিতা—কিন্তু দেখলি ত ভাই অভিনয় করল কেমন চমৎকার! বাংলা থিয়েটারে এমন সজীবতা, এমন তন্ময়তা দেখিনি।"

রমেনের হৃদয়ে কে যেন শেলাঘাত করিল। ইরা শেষে রক্ষিতা—হায়! হায়! দুঃখে ও বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর মথিত হইয়া গেল। য়ুরোপীয় ভাবের সুরা দেশকে কি এমন করিয়া ছন্নছাড়া করিবে?

বরেন বলিল—"কথা বলছিস নে যে ?"

"ভাবছি, মেয়েটির দুর্ভাগ্য—আধুনিকতার প্রায়শ্চিত্ত সে করছে—"

"তা সত্যি—ও যখন আসে তখন কাগজে কাগজে কি হৈ চৈ—শিক্ষিতা, সভ্যা, তরুণী কিন্তু হলে কি হয়—এ বড় কঠিন ঠাঁই।"

যবনিকা উঠিল, অভিনয় চলিল।

কি যে অভিনয় হইতেছিল রমেন তাহা দেখিল না—তাহার সমস্ত অন্তর ইরার শোচনীয় অধঃপতনে দুঃখে ও অভিমানে জ্বলিতে লাগিল।

ইরা রূপসী—ইরার মনীষা অদ্ভুত, ইরার বচনপটুতা অনুপম, ইরা সমাজের অলঙ্কার হইত, সেই ইরা আজ পঙ্কের কর্দ্দম-মলিন—রমেনের কান্না পাইতে লাগিল।

করতালি ধ্বনির মধ্যে অভিনয় ভাঙ্গিল। রমেন অজুহাত করিয়া পিছনে রহিয়া গেল। ইরার সহিত সে আলাপ করিবে—ইরার সঙ্গে শেষ দেখা না করিয়া তাহার মন কিছুতেই তৃপ্ত নহে।

থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া সে বলিল—"ইরার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার চশমা খুলিয়া রমেনের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন পরে বলিলেন—"ইরা দেবীর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"আমার নাম করলেই দেখা করবেন ?"

"না না মশায় যান, এখানে কাপ্তেনি করবার জায়গা নয় !"

ক্ষোভে ও বেদনায় চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। থিয়েটারের লোক যে সমাজে মেশে, যে ভাবে চলে, তাহাদের নিকট হইতে ভদ্র ও মধুর সৌজন্য আশা করাই অন্যায়, সে মনে করিল ফিরিয়া যায়।

কিন্তু মন ফিরিতেই চায় না, নীচে আসিয়া সে দারোয়ানকে একটি টাকা ঘুস দিয়া বলিল,—"ইরা দেবীর গাড়ীটা আমায় দেখিয়ে দিবি।"

দারোয়ান খুসী হইয়া গেল, ভয়ে ভয়ে বলিল,—যে ইরা অন্যান্য অভিনেত্রীর মত নহে, তাহার সহিত প্রেম কৌতুক করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে।

ইরা যখন মোটরে উঠিবে রমেন আসিয়া ডাকিল—"ইরা।"

"কে রমেন বাবু, আসুন আসুন—তারপর এখানে ?"

"এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এসেছিলাম, কিন্তু না এলে হয়ত ভাল হ'ত।"

ইরা মোটরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—"ভিতরে বসুন, যেতে যেতে আপনার কথা শুনব ?"

রমেন উঠিল, মোটর বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। ইরা—"তারপর কি বলছিলেন ?"

"তুমি এমন করে আত্মহত্যা করলে কেন ?"

"আত্মহত্যা কিসের ? অভিনয়ের জগৎ তুচ্ছ নয়, মানুষের মনের উপর এর অসামান্য প্রভাব…"

"কিন্তু তুমি কেন এলে ?"

"তার মানে তুমি দাসীপণা না করে কেন এলে, এইত ? সে কথা ত সেদিন বলেছি, সংসারে ফুটে ওঠাই সার্থকতা, আমার মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে তা দিয়ে আমি বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নূতন সৃষ্টি গড়ে তুলতে পারব, এর কি কোনই মূল্য নেই !"

"ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ! পরকালের পথ ঝরঝরে হবে, পরকালের ভাবনা ছেড়ে দিন, কর্ম্মের জগতে একটা নূতন অবদান দিলেই জীবন সার্থক হয়ে যাবে।"

রমেন বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন—কিন্তু জীবেশ সান্ন্যাল ?"

ইরা বলিল—"আসল কথা বলুন, আপনার শিকার হাতছাড়া হয়েছে তাই রাগ হয়েছে ?"

ইরা দমিল না, শ্লেষ ও কৌতুকের বাণ তার অফুরন্ত।

"কি চুপ করলেন যে ?"

"চুপ করব কেন কিন্তু এত বড় অধঃপতন আশা করতে পারিনি।"

"জীবেশ সান্যাল বাংলার অদ্বিতীয় নট তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে ?"

"বিয়ে হয়েছে ?"

"আপনারা যাকে বিয়ে বলেন এ তা নয়, যতদিন খুসি ততদিন এ বিয়ের মেয়াদ তবু এটা বিয়ে···"

রমেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল সে কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল—"আমায় নামিয়ে দিন।"

"কেন আমার সঙ্গ আপনার অতিষ্ট হয়ে উঠছে, বলুন বাসায় দিয়ে আসি।"

"না, না, এই মোড়েই নামিয়ে দিন, আপনার সঙ্গে আমি বাসায় যেতে পারব না।"

ইরা নামাইয়া দিয়া বলিল—"রমেন বাবু! কিন্তু যে ভালবাসা জানিয়েছিলেন এইত তার পরিচয় ?"

"না না, ভুলে যাবেন, কোন দিন কোন সময় আপনাকে ভাল বাসিনি, সে মোহ—সে মিথ্যা—"

ইরা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল—"পুরাতন সংস্কারের ভূত আপনার মাথায় চেপে আছে, তাই নূতনকে তার মর্য্যাদা দিতে পারেন না, নূতনের সজীবতা ও মুক্ত প্রাণ আপনাদের ভয়ে দমে যাবে না—যাক্ নমস্কার।"

ইরা চলিয়া গেল ! রমেন হতভম্বের মত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিল বাসায় ফিরিয়া সে মাকে বলিল—"মা বিয়ের ঠিক করে ফেলো।"

রমেনের মাতা অবাক বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমেন বলিল,—"উপহাস নয় মা, যত তাড়াতাড়ি হয় হোক্ আমার কোনই আপত্তি নেই।"

পুত্রের সুমতি হইয়াছে মনে করিয়া মাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। কিন্তু সংসারে যাহা বাহিরে দেখি, তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে সুখের হইত। কিন্তু তাহা যে সত্য নয়, সে কথা কয়জনে মনে রাখে ?

বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া

—এক—

সুধীর, রেবা আর মণ্টু—স্বামী, স্ত্রী ও ছোট্ট ফুটফুটে খোকা। দারিদ্র্য, অভাব, প্রণয় ও বাৎসল্য এই নিয়ে সংসারের যাত্রা চলে।

সুধীর পত্নীকে আদর করিয়া বলে—'ক্ষেপী।'

রেবার ভ্রূকুঞ্চিত হয়। কলহ চলে। মান, অভিমান, চোখের জল, চাকরের দৌরাত্ম্য, অভাবের নিষ্পীড়ন—তার ভিতর দিয়া সংসারের রথচক্র বহিয়া চলে।

পূজা আসিতেছে।

আকাশের স্বর্ণ-দ্যুতি, বর্ষণহীন মেঘের বর্ণচ্ছটা—শেফালির মন্দ সৌরভ মনকে পুলকোচ্ছ্বসিত করে।

শুধু সুধীরের সংসারে নিরানন্দ।

ক্ষেপী এবার ক্ষেপিয়াছে। সে বাপের বাড়ী যাইবে।

রেবার পিতৃদত্ত নাম পছন্দ হয়নি, কোন্ মেয়েদেরই বা হয়। নাম পরিবর্ত্তন আজ কালকার 'চল'।

রেবা সুধীরকে বলে, "আমায় একটা ভাল নাম খুঁজে দাও না, একেবারে আনকোরা নূতন হওয়া চাই।"

সুধীর পরিহাস করিয়া বলে "বেশ একটা রাশিয়ান নাম রাখো না, যেমন ওস্কোলফিনা কিম্বা কুর্দ্দিয়াকোডা ?

রেবা চটিয়া যায়, বলে "যাও, অমন যদি কর ত বলছি—"

কথা কাড়িয়া লইয়া সুধীর বলে "কি আর করবে বল—বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত দৌড়—সেত ঠিক করে ফেলেছে ?"

রেবা সুধীরের কথা বেদনা না ব্যঙ্গ বুঝিতে চাহে—তাই থামিয়া সুধীরের মুখের দিকে চায়।

"না, ঠাট্টা নয়, একটা ভাল নাম রাখলে বুঝি আমারই ভাল হবে, সেকেলে নাম বললে সভ্য-সমাজে লজ্জা হয়।"

"লজ্জা, বল কি ? রেবা যে পঞ্চনদের পুণ্যতোয়া নদী—যার তীরে তীরে ভারত সভ্যতার প্রথম বনিয়াদ পত্তন হয়েছে।"

"হয়েছে, তোমার বক্তৃতা এখন রাখ, এটা তোমার লেক্‌চার হল নয়—জান ত নদীর নামে নাম রাখতে নেই।"

"বেশ তা হলে মন্দোদরী রাখা যাক—বেশ গাল ভরা নাম—এ নাম বোধ হয় তোমার কোন মেয়েরই নেই, আজকালকার বিশ্বমৈত্রীর যুগে—"

"আবার ! নাম দু' অক্ষরে চাই, নতুন হবে অথচ সুন্দর হবে—"

"আচ্ছা ধর, আশা, ভাষা, চলা, কলা, ছবি, ভবি, গোপী, তপী, মুখী, সখী,—

"যাওঃ তোমার সঙ্গে যদি কথা বলি।"

পট-ভূমিতে কিয়ৎক্ষণ নীরব শান্তি—যেন শ্রাবণের জলভরা মেঘে পৃথিবী অন্ধকার। খানিক পরে নভঃলতার রুচির হাস্য—আবার লঘু আলাপন।

সুধীর বলে—"ঘাট হয়েছে, আচ্ছা ধর 'এষা'

হাসির গোপন মাধুর্য্যে রেবা বলে, 'বেশ ত, কিন্তু অক্ষয় বড়াল যে ওই নামে বই লিখেছেন।'

"বেচারী মারা না গেলে এক্ষুণি নোটিশ জারী করে দিতাম, বাপ বাপ করে নাম বদলাত।"

মেঘচ্ছায়া।

সুধীর সামলাইয়া লইয়া বলে—"পেয়েছি, এইবার পেয়েছি বল আমায় কি উপহার দেবে?"

রেবা পুলকিত হইয়া উত্তর দেয় "যা চাও তাই।"

কৌতুক করিয়া সুধীর প্রশ্ন করে—"যা চাই তাই, বল তিন সত্যি।"

শঙ্কিত রেবা উত্তর দেয়—অবশ্য যা সাধ্য তাই।

"আচ্ছা তাই সই, বলছি 'এণা', কেমন পছন্দ হয়েছে।"

রেবা উচ্ছল আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলে—'বা! সত্যিই তোমার খুব বুদ্ধি'।—

'সার্টিফিকেট নয়, চাকরীর উমেদার নই, কিন্তু তুমি বাপের বাড়ী যেতে পারবে না—বল, এই বর আমায় দাও।'

সমস্ত আনন্দ মুহূর্ত্তে বিরূপ হইয়া যায়।

ব্যাধ-ভীতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তা রেবা বলে 'বা এই বুঝি তোমার উপহার চাওয়া।'

'কেন এ ত মোটেই অসাধ্য নয়।'

রেবা কথা কহে না। সুধীরের চাতুর্য্যে ক্ষুব্ধা হইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহে।

পট-ভূমিতে সহসা যেন যবনিকা নামে।

—দুই—
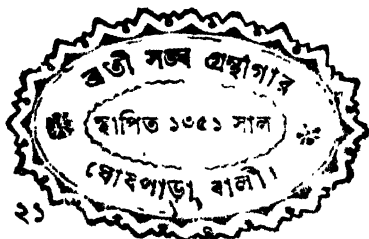
অনুনয় বিনয়, চাতুর্য্য সকলই বিফল।

এণা বাপের বাড়ী যাইবেই যাইবে। সুধীরের প্রবোধ ও আবেদন ব্যর্থ।

ভোরের বেলা সুধীর খোকাকে লইয়া খেলা করিতে বসিয়াছে। খোকা কথা বলিতে চেষ্টা করে—আঙ্গুল দিয়া ইহা উহা দেখাইয়া বলে—'এঁ্যা, হেঁ।'

সুধীরের বন্ধু যতীশ আসে। খোকাকে নাচাইতে নাচাইতে বলে 'কি আজ এত গম্ভীর কেন ভায়া!'

সুধীর কষ্টে হাসি আনিয়া বলে,—'কই, তবে খোকা চলে যাচ্ছে—তাই ভাবছিলুম। দেখনা ভাই মায়া, ওর ছোট্ট মুখের হাসিটা না থাকলে, এত বড় বাড়ীটে অন্ধকার হয়ে যাবে, সে কথা তোমাদের বন্ধুজায়া কিছুতেই বুঝছেন না।'

"শুধু কি খোকারি জন্য, আর কোনও কারণ কি নেই?"

"না ভাই, ওসব দিন কি আর আমাদের আছে—তোমাদের প্রথম প্রণয়, তোমাদের মনে জাগছে 'সখি জাগো জাগো'—আমাদের এখন গভীর দায়িত্ব—"

"হয়েছে বীর, এ ঠিক ভবেন বাবুর কথা হ'ল, ভবেন বাবু ত ছেলে পিলে পাঠিয়ে দিয়ে ম্রিয়মান হয়ে আছেন, সেদিন ক্ষোভে বল্লেন 'শক্তির জন্য মনটা কেমন করে'—শক্তি ভবেন বাবুর ছেলে কিন্তু শক্তির জন্যই তার মন কেমন করছে, এ ব্যর্থ ভাষণ, বিরহী বুঝতে পারলেন না, আমরা সবাই হো হো করে হাসতে লাগলাম।"

"এ সব কি বুঝেছ যতীশ! একা থাকতে একটু কষ্ট হয়, তাই তোমাদের বৌদিকে বলছিলাম, তার পর সন্তান-স্নেহ যে কি জিনিষ, তা তোমরা বুঝবে না।"

"তা বটেই, কিন্তু কোনও উপায় কি নেই, না হয় আমরা ডেপুটেশানে যেতে রাজী আছি।"

"না ভাই ও সবে কি হবে, ভবী ভুলবার নয়।"

আর্ত্ত-বেদনা শরতের বাতাসকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। অতীন পথ দিয়া যাইতেছিল—বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়া বলিল,—"এস না ভাই বেড়িয়ে আসা যাক।"

যতীশ হাসিতে হাসিতে উত্তর দেয়—"সুধীরের যে অবস্থা তাতে ও 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' মন্ত্র পড়ছে—"

"কেন ব্যাপার কি!"

"ব্যাপার বড় সঙ্গীন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনা চলে না, এখানে এস।"

"না ব্যস্ত আছি, তোমরাই চল, আমি মুস্কিল আসানের কথা বলে দেব'খন।"

—তিন—

পরের দিন বৈকালে সুধীর এণাকে বলিল—"আমি তাহলে এক কর্ত্তব্য স্থির করলাম।"

এণা আঁচল দোলাইয়া বলে,—"কি?"

স্বামী-প্রেম-গর্ব্বিতার আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

সুধীর বলে,—"তুলসীদাসের গল্প জান ত?"

"কেন?"

"আমিও ঠিক করলাম, ভগবানের চরণ বই আর শরণ নেই—শঙ্করাচার্য্য ঠিকই বলেছেন—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।”

“হয়েছে সংস্কৃত বুলি আউড়ে কাজ নেই, ভগবানে ভক্তি হয় ত ভালই।”

এমন সময়ে বাহিরে শব্দ হইল—“জয় হোক মা!” দরজা খুলিয়া সুধীর দেখিল, নামাবলী গায়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রুক্ষস্বরে সে বলিল—“কি চাই?”

আগন্তুক উত্তর দিল—“আমি একজন জ্যোতিষী।”

“যাও, যাও, এখানে ওসব বুজরুকী চলবে না।”

দৈবজ্ঞের কাতর মুখ এণার অন্তর স্পর্শ করিল। সে বাহির হইয়া বলিল—“ঠাকুর! খোকার হাত দেখুন ত।”

খোকা পিতামাতাকে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া পুস্তকের রাশি লইয়া ছড়াইতেছিল এবং এখানির এক পাতা, অপরখানির একখানি ছবি বাহির করিয়া হৈ হৈ করিতেছিল।

খোকাকে আনা হইল।

জ্যোতিষী খড়ি লইয়া বসিলেন—শ্লেটে অঙ্ক আঁকিয়া বলিতে লাগিলেন —“মা আপনার পুত্রের শুভ-ভাগ্য-যোগ দেখছি, আপনার পুত্র যশস্বী ও কুলপ্রদীপ হবে। জৈমিনি বলেছেন—সুধীর বলিল—“হয়েছে আর শ্লোক আওড়ে কাজ নেই এইবার রত্ন-গর্ভা জননীর হাতখানি দেখুন।”

এণা স্বামীর ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিল না। জ্যোতিষীর ইঙ্গিতে নীরবে হাত বাড়াইয়া দিল।

জ্যোতিষী সমীহা সহকারে ভাগ্যফল বলিয়া চলিলেন, আয়ুস্থান, পুত্র-স্থান, আয়স্থান সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া চলিলেন। খানিক পরে মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন কিন্তু মা!

সুধীর বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"হাঁ, বলে ফেলুন, ফাঁড়া বড় একটা ফাঁড়া আছে—আর গ্রহশান্তি চাই—নবরত্ন চাই। শিলাকাঞ্চন চাই—বলুন থামলেন কেন?

এণা বাধা দিয়া বলিল,—"তুমি অমন অভদ্রতা করছ কেন?"

সুধীর উত্তর দিল "তোমার এই সব গাঁজাখুরী আমি একদম বিশ্বাস করিনে।"

"না কর করবে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে এমন ইতরামি করতে পারবে না।" সুধীর থামিয়া যায়।

এণার আশ্বাসে আশ্বাসিত জ্যোতিষী বলেন,—"মা, অশুভ বলতে নেই, কিন্তু আপনার ঔদার্য্য আমায় মুগ্ধ করেছে, মা আপনার স্বামীর সঙ্গেই থাকা আপনার উচিত, অন্ততঃ ছয়মাস স্বামীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা আপনার চাই···

আশা করি সতীর তেজে···"

আশঙ্কায় এণার মুখ মলিন হইয়া ওঠে। জ্যোতিষীও সুধীরের মুখে হঠাৎ কি ভাব-বিনিময় হইয়া যায়—এণা হতবুদ্ধির মত জ্যোতিষীর মুখের দিকে চাহিয়া রয়।

"না মা! ভয়ের কোনও কারণ নেই···ভবানীপতি আপনার মঙ্গল করবেন, সতীরাণী আপনি।"

এণা জ্যোতিষীর কথায় ও ভাষায় কি যেন আভাস পায়। আপনাকে সামলাইবার জন্য সে বলে, "আপনি বসুন আমি দক্ষিণা আনছি।"

এণা ভিতরে চলিয়া যায়। খোকন 'এঁ্যা' করিয়া চীৎকার করে···মায়ের পিছনে পিছনে চলিতে থাকে। জ্যোতিষী হাস্য-মধুর কণ্ঠে উত্তর দেন, "না মা" দক্ষিণার কাজ নেই, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"
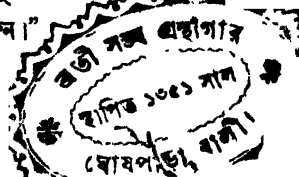
এণা খোকাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল···জ্যোতিষী নাই। সুধীর গম্ভীর মনে বসিয়া আছে, এণা স্বামীকে বলিল, "আচ্ছা তুমি কি ভাব এগুলি মিথ্যে···"

"মিথ্যে একেবারে জলজ্যান্ত মিথ্যে।"

এণার মনে সন্দেহের হিন্দোল-দোলা বহে। পতি ও পত্নী বসিয়া রহে।

শরতের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ···লঘু মেঘের বিচিত্র দোলা···পথিকের চঞ্চল গতি কিছুই উভয়কে ব্যতিব্যস্ত করে না।

এণা খানিক পরে বলে, "শুনছ তাহলে না হয় মাকে লিখে দেই, এবার আর পূজায় যাচ্ছিনে, কি বল ?"

অলস ঔদাস্যে সুধীর বলে, "তাও কি হয়, তুমিও যেমন, ঐসব বুজরুকী শুনে তুমি বুঝি ভড়কাচ্ছ, ওসব একটা বিরাট ফাঁকি।"

এণা কথা কহে না। বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকে। স্বামীর এই পরম ঔদাসীন্য তাহার কিছুতেই ভাল লাগিতে ছিল না।

—চার—

এণা যাইতেছে না এই উল্লাসে উল্লসিত হইয়া সুধীর স্ত্রীর প্রিয়কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সকালে উঠিয়া সেতার বাজানো তার নেশা ছিল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ওস্তাদ রাখিয়া শিক্ষানবিশী করিলেও সুর-লক্ষ্মী দয়া করেন নাই, কিন্তু সে কথা কে শোনে।

অজ্ঞ শ্রোতৃ-সমাজে সুধীর রাগিনী আলাপ করিয়া চলে কেহ ফরমাস করে গৌড়সারঙ্গ, কেহ মালকোষ, কেহ সিন্ধু কাফি, কেহ তোড়ী ভৈরবী। কিছুতেই সুধীরের বাধে না।

শুধু যেদিন ওস্তাদ আসে, সেদিন সুধীরের সহিত ডুগী তবলার কলহ হয়, তবলচির অভাবে সুধীর সেদিন বাজায় না।

প্রিয়তম সেই নেশা ভুলিয়া সুধীর সেদিন খোকাকে রাখিতে বসিয়াছে। খোকা বড় দুষ্ট হইয়াছে···তাহাকে চোখে চোখে না রাখিলে রাখাই ভার। সুধীর দৈনিক খবরের টাটকা খবর পড়িতে যেই মনোনিবেশ করিয়াছে, অমনি খোকা সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া নাচিতে নাচিতে রাস্তার দিকে চলিয়াছে।

এমন সময় যতীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যতীশ খোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যালো জুনিয়র, খবর কি ?"

খোকার আনন্দের সীমা নাই। যতীশকে দেখিয়া সে ফুল্লমনে হাঁ ও হুঁ আরম্ভ করিয়া দিল।

. যতীশ অন্যত্র চলিতেছিল, কিন্তু এই স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না।

যতীশ আসিয়া বসিলে খোকা যতীশের চেরীকাঠের বাঁকা লাঠি লইয়া ঘুরাইতে লাগিল, তাহার আহ্লাদের সীমা দেখে কে।

সুধীর কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "না ভাই আর পারা যায় না, চারি দিকের এই বিষাদের টানে মন একেবারে মুচড়ে দিচ্ছে—"

"কেন কি হ'ল ?"

"এই দেখ না ব্রহ্মপুত্রে জল বেড়ে প্লাবনে লোকের সব সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।"

"এত বাইরের খবর, তোমার রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন চলছে ত?"

মেয়েদের আড়ি পাতা স্বভাব সর্ব্বজন বিদিত। স্বামীর ও বন্ধুর কথোপকথন শুনিবার জন্য এণাও আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

কৌতূহলই সত্য লাভের মূল। কৌতূহলকে অবজ্ঞা করা চলে না।

"তাই বা কোথায় ভাই এই দেখ না সেদিন এক ব্যাটা জ্যোতিষী এসে ভড়ং করে গেল, আর গিন্নী তাই মেনে ভয়ে কাতর হয়েই আছেন।"

সুধীর ব্যাপারটাকে রং চং দিয়া যতীশকে জানাইল। যতীশ শুনিয়া বলিল "এত শাপে বর। কিন্তু যাই বল ভাই, জ্যোতিষকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।"

"কারণ"

"ওটা যে সফল শাস্ত্র, সূর্য্য চন্দ্র ওর সাক্ষী—"

"কি যে বল, এই বিজ্ঞানের যুগেও অন্ধ বিশ্বাস—"

"তোমরা মানবে না তাই বল—আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি—সেবার মামার বাড়ীতে একজন জ্যোতিষী এসে বলেছিলেন দাদামশায় অমুক দিনে অমুক সময়ে মরবে, কাঁটায় কাঁটায় সে সময়ে দাদামশায় মারা গেলেন—আমরা ত অবাক—অবশ্য সে সব হ'ল সিদ্ধ জ্যোতিষী।"

সুধীর যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "সত্যি, এ জ্যোতিষীর চেহারাও মন্দ নয় ভাই, তারপর একেবারে নির্লোভ, কিছু না নিয়েই চলে গেলেন—"

সুধীরের সুর শ্রদ্ধায় নম্র। যতীশ বলিল—"লেখা পড়া শিখলে কি হয় ভাই, মেয়েদের মনের সহজ সুরের কাছে সত্য আপনি দেখা দেয়, বৌদিকে আমার নমস্কার জানাস, তিনি যে মতলব করেছেন ভালই করেছেন।"

—পাঁচ—
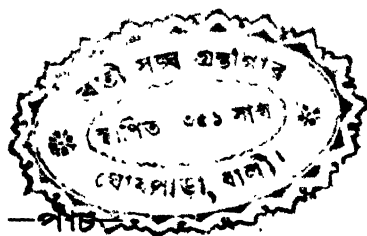
সুধীরকে আর পায় কে ?

শরতের আকাশে যেমন মেঘ-ভাঙ্গা ঝল মল রোদ, তার মনেও তেমনি বিষাদ-হারা স্ফূর্ত্তি।

কয়েকদিন সে হল্লা করিয়াই কাটাইল। ক্লাবে রাত বারটা পর্য্যন্ত তাস খেলিল। বন্ধুরা অবাক হইয়া গেল।

ভাগ্য-বিপর্য্যয় জগতের গতি। হাসির পরে কান্না, কান্নার পরে হাসি, ছন্দের তালে তালে আসে ও যায়। পূজার ছুটী সমাগত প্রায়।

সকলের জল্পনা চলিতেছে—কেহ কাশ্মীর, কেহ ওয়ালটেয়ার, কেহ কার্শিয়ং বেড়াতে যাবে।

সুধীর পত্নীকে আদর করিয়া বলে "চল না এণা কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক। শিমলা থেকে ত বোনেরা লিখছে।"

এণার যেন উৎসাহ নাই—সে পাকা গিন্নীর মত বলে "সংসারে যে টানাটানি, একটু বুঝে চলতে হয়ত।"

"জীবনটা যদি একটা হিসেবের খাতা করে ফেল এণারাণী! তাহলে আর সুখ কোথায়? গরীব বলে মনে কোন সুখাশাই থাকবে না, আমি অত বিবেচনা করে চলতে পারব না।"

এণা বলে—"বেশ কিন্তু সংসার চালানোর ভার, তাহলে তোমার, আমি বসে বসে কেবল বইই পড়ব তাহলে।"

এটা অবশ্য হাঙ্গাম, সুধীর অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা ভোলে নাই—পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তাব আনিয়াছিল। পত্নীর জন্য তাহার দুঃখ হয়।

বিলাসের দিকে তার নিজের লক্ষ্য নাই—কিন্তু এই তরুণী বধূ চারিপাশের বিলাসের জলুসে মর্ম্মদাহ অনুভব করে তাহা সে বুঝে।

সেদিন ভোরে হঠাৎ সুধীরের শ্যালক আসিয়া উপস্থিত। সুধীর বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল "তারপর কি মনে করে?"

শ্যালক বলিল দিদিকে নিয়ে যেতে এলাম।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সুধীর কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। সে ভাবিল 'বোধ হয় কোথাও কোন প্রকার ভুল হয়েছে।' সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল "সে কি বলছ মনোজ! তোমার দিদি যাবেন না, এইত জানি।"

মনোজ ভগ্নীপতির মনের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বুঝিতে না পারিয়া সরল ভাবে বলিল "কই না মাঝে একবার লিখেছিলেন যে যাওয়ার হয়ত বাধা হবে, পরে লিখেছেন যে যাবেন, সেই চিঠি পেয়েই ত আমি চলে এসেছি।"

সুধীর অবাক হইয়া গেল। অতীন এমেচার থিয়াটারের ভাল একজন অভিনেতা। বন্ধুর বিপদে সে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জ্যোতিষী সাজিয়া সে ত আসিয়াছিল। সুধীর ভাবিয়া পাইল না কেমন করিয়া তাহার এই গুপ্ত খবর এণার কর্ণগোচর হইল। সে বসিয়া বসিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। পত্নীর চাতুর্য্যে সে যুগপৎ পুলকিত ও ব্যথিত হইল।

এণার সহিত দেখা হইলে সে বলিল, "না, আমি ভেবে দেখলাম স্বামীর কথাই শোনা উচিত।"

সুধীর রুদ্ধ আক্রোশে চুপ করিয়া শোনে, তাহারই শেখানো কথা। তবু শেষ-রক্ষা করিবার জন্য বলে, "না আমি বুজরুকি বললে কি হয়, ওরা ওসবই বিশ্বাস করে।"

"ওরা করে করুক, তুমি ত বলেছ, সতী নারী স্বামীগত-চিত্ত হবে, স্বামীর

ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, স্বামীর সুখেই সুখ।" তুমি যখন জ্যোতিষ বিশ্বাস কর না, আমিও করব না।"

অপ্রতিভ সুধীর কি বলিবে, ভাবিয়া পায় না।

যাওয়ার দিন এণা যখন খোকাকে কোলে করিয়া বিষণ্ণ স্বামীকে আসিয়া বলিল, "তাহলে আসি।"

"এস, কিন্তু খোকাকে রেখে যাও।"

এণা হাসিতে হাসিতে বলে, "বেশ খোকা যদি থাকে, রেখে দাও তা হলে ত আমার অর্দ্ধেক জ্বালা থাকবে না।"

কিন্তু খোকা নাছোড় বান্দা, সে পিতার কোলে চড়িল বটে, কিন্তু মা এক পা চলিতেই কাঁদিয়া উঠিল 'মা'। অতএব এফন্দীও খাটিল না।

যতীশের কথা মনে পড়িল, "আর কারও কি বউ নেই, আর কারও বউ কি বাপের বাড়ী যায় না।"

যতীশের সদ্যোবিবাহিত স্ত্রীও ত এবার পূজায় বাপের বাড়ীতেই থাকিবে।

কিন্তু, থাক সে সবে আর কাজ নেই। আত্ম দমন করিয়া সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু এবার তুলসীদাস হচ্ছি।" এণা প্রেমময় স্বামীর বাক্য-বাণ নীরবে মধুর হাসি হাসিয়া গ্রহণ করিল। চলিবার মুখে শুধু বলিল, "রোজ চিঠি দিও।"

সুধীর উত্তর দিল না। রুদ্ধ অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল।
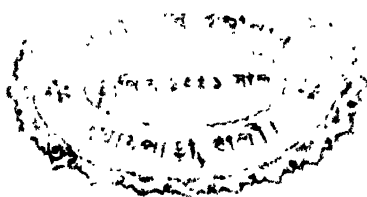
বালুচরের ডাক

—এক—

পদ্মার বালুচর দিগন্ত বিস্তৃত। বালুরাশি ধু ধু করে। রৌদ্র কিরণে জলরেখার পাশে রূপালি বালুর ছবি ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া কুমার জগদীশ পদ্মাতীরে প্রমোদ-কানন তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

প্রথম যৌবনের প্রণয়-বিহ্বল স্মৃতি বেলা-সৌধ। প্রথমা পত্নীর সে স্মৃতি মুছিবার নয়।

তবু সংসারে সংসারী সাজিতে হয়। আবার জীবনে নূতন বধূর সাথে নূতন জীবন।

কুমার জগদীশ ও তরুণী বধূ সুরূপা বেলা-সৌধে কয়েকদিন আসিয়াছেন। প্রথম মিলন আর দ্বিতীয় মিলনে কি দুস্তর ব্যবধান!

সুরূপা সত্যই সুন্দরী!

সৌন্দর্য্যের সে মোহ কুমারকে বিহ্বল করে কিন্তু তবু উভয়ের অন্তরের প্রেরণার মাঝে যুগ যুগান্তের ব্যবধান।

কুমার কারণে অকারণে বেলার প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার গল্প করেন। সুরূপা অনেক সময়ই তাহা আনন্দে শোনেন। কিন্তু কখনও কখনও অজ্ঞাতসারে কি যেন বেদনা অনুভব করেন। কারণে অকারণে বিপ্লব ও কলহের সুরু হয়।

সতীন!

কথাটি কত ব্যথায় ভরপুর। কত নারী কতদিন যে ব্যথা অনুভব করিয়াছে তাহার বীজ বাতাসে যেন ভাসিয়া আসে, অদৃষ্ট এই ভাব-বীজই বোধ হয় সংস্কার। সেই সংস্কারই মিলন-ব্যাকুলা হৃদয়ময়ী এই নারীকে জ্বালাময়ী করিয়া তোলে।

জ্যোৎস্না রাতে কথা হইতেছিল। খোলা বারান্দায় বসিয়া কুমার বলিলেন, "ঐ বালু পথ দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে আমরা বেড়াতে যেতুম "

স্বরূপা বলিলেন, "বুঝতে পারছি তুমি আমায় ভালবাস না?"

"কেন?"

অপ্রতিভ কুমারের বাক্য যেন সরে না। ঈর্ষা জাগিয়া ওঠে, স্বরূপা অভিমানাহত ব্যঙ্গে বলেন—"তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি?"

"তুমি আমায় ক্ষমা করো স্বরূপা, কিন্তু তোমাকে আমি অনেক উঁচু বলেই জানতুম "

"তোমার সমস্ত মন প্রাণ অপরকে দিয়ে আমায় নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে এ আমি সইতে পারবো না "

স্বরূপা চলিয়া গেলেন।

কুমার বসিয়া বসিয়া জ্যোৎস্নায় বিধৌত পদ্মার বালুচর দেখিতে লাগিলেন।

অতীতের স্মৃতি মনে জাগে। বালুচরের পাশেই প্রথমা প্রিয়া বেলার চিতাশয্যা হইয়াছিল। সেই চিতার দিকে চাহিয়া বেলার কথা মনে পড়ে।

জীবন ও মৃত্যুর রহস্য অসীম।

বেলা কুমারকে বলিয়াছিলেন, "জনমে মরণে আমি তোমারই থাকব।" আজ সুগভীর ব্যথার দিনে সেই কথাই মনে জাগে।

জ্যোৎস্নায় বালু ধু ধু করে পদ্মার জল-রেখা সর্পিল গতিতে বহিয়া চলে কিন্তু ও কি?

কুমার চোখ মুছিলেন আবার চাহিয়া দেখিলেন। শুভ্রবসনা কে ওই নারী হাতছানি দিয়া ডাকে ?

চোখের ভ্রম ? না, কুমার ত জাগ্রত। ওই যে ডাকে, কুমার সুস্পষ্টই দেখিলেন সে যেন বেলা।

কুমার যেন বিহ্বল। অন্তর শঙ্কায় ও আনন্দে উদ্বেল। বেলা ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে ! কে ঐ নারী কেন ওখানে নিশীথ রাতে ?

কুমার ভীতি-বিহ্বল। আড়ষ্টতা কাটিলে চাহিয়া দেখেন কেহই নাই শুধু পদ্মার বালুচর ধু ধু করে। জ্যোৎস্নার শুভ্র বালুকণা চিকমিক করে ?

কিন্তু শুধু কি ছায়া ? কুমারের মনে হইল ও যেন ছায়া নয়।

—দুই—

ঝিয়ের সঙ্গে সুরূপার কথা হইতেছিল।

মোক্ষদা বলিল—"স্বামীকে বশ করতে হয়—তোমার সতীন ওর মনকে ভুলিয়ে রেখেছে—তার দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে—"

সুরূপা আধুনিকা, মোক্ষদার কথায় তাহার বিশ্বাস হয় না—। সে আজগুবিকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি ইপ্সীত-সাধন জীবনের এত আকাঙ্খিত যে তার জন্য অবিশ্বাস্যকে অবলম্বন করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হই নাই, সুরূপার মনেরও সেই অবস্থা—।

সুরূপা বলিলেন—"যাও তোমার বুজরুকি রাখো।"

"বুজরুকি নয় দিদিমণি বুজরুকি নয়—আমি পরখ করেছি—আমার তিনি ছিলেন আস্ত গোঁয়ার, ভুলেও আমার দিকে তাকাতেন না—আমার ঠাকুরমা

ছিল এবিষয়ে ওস্তাদ—বুড়ীর সাথে কামরূপ কামিখ্যের ডাইনিদের ছিল জানাশোনা। বুড়ী দিল কবচ আর বাছাধন কোথায় যান তারপর থেকে কুকুরের মত আমার পিছন পিছন ফিরতেন।”

সুরূপার হাসি পাইতেছিল। মোক্ষদা চিরদিনের দাসী এইভাবে সে তাহাকে দেখিয়াছে। মোক্ষদাও বধূ ছিল, তাহারও প্রণয়োচ্ছল প্রাণ ছিল এ কথা যেন ভাবনাতে জাগে না।

সুরূপা বলিলেন—“না এ সব করতে পারবো না।”

মোক্ষদা বলে—“ভয় নেই কিছু, দিদিমণি—ওই গাঁয়ের শ্মশানে একটা সন্ন্যোসী এসেছেন তাকে কিছু দিলেই একটা বিহিত হবেই। তুমি আমায় কাল দুপুরে ছুটি দাও—আমি একটা হেস্তনেস্ত করছি—বুঝেছ, দৃষ্টি পড়েছে।”

“দৃষ্টি! কিসের দৃষ্টি?”

“ন্যাকা· কোথাকার এই টুকু বোঝ না সংসার করবে কেমন করে? দৃষ্টি—তোমার সতীনের দৃষ্টি পড়েছে।”

সুরূপা বিরক্ত হইয়া ওঠেন—বলেন—“মোক্ষদা আমায় জ্বালাসনে—এ তোর টাকা নেওয়ার ফন্দি—আমায় ফাঁকি দিয়ে চালাকি করে টাকা নিতে পারবিনে—তার চেয়ে বল তোর কি দরকার আমি তার ব্যবস্থা করছি।”

মোক্ষদা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। টাকা যে সে আত্মসাৎ করিবে না তাহা নহে—কিন্তু মনিবকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার একটুকুও ছিল না—

সে আহত হইয়া বলিল—“ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, না হয় ছোটলোক—দু’ এক টাকা চেয়ে নেই কিন্তু তাই বলে কি আমরা মানুষ নই।”

সুরূপা বুঝিলেন—মোক্ষদা ব্যথা পাইয়াছে তাই তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—“তা বলছিনে তবে ওসব মন্ত্র কবচে আমার বিশ্বেস নেই—”

"বল কি দিদিমণি, কামরূপ কামিক্ষ্যের গল্প শোননি—সেখানে মেয়েরা পুরুষকে ভেড়া করে রাখত—তুমি কিছু টাকা দাও আমি না হয় সন্ন্যেসীকে একটা যজ্ঞ করতে বলব—।"

সুরূপা স্বামীর কাছে আদর পায়নি একথা বলিলে ভুল হইবে কিন্তু নভেল পড়িয়া তিনি যে প্রেমের স্বপ্ন-লীলার আশা করেন—কুমার জগদীশের নিকট তাহা তিনি পান না—মোক্ষদার প্রলোভন তাই তাহার নিকট অবিশ্বাস্য হইলেও উপেক্ষণীয় হইতে পারিল না।

সুরূপা বলিলেন—"আমার ইচ্ছে নেই—তা তুই যখন বলছিস—তখন কাল দুপুরে না হয় যাস্।"

"যাবনা দিদিমণি—খুবই যাব—তোমার জন্য আমি কি না করতে পারি—তা হলে এবার আমায় দু গাছা রুলি গড়িয়ে দেবে তো?"

সুরূপা উদাস সুরে উত্তর দিলেন—আচ্ছা।

—তিন—

পরদিন রাত্রে আবার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে।

অনুতপ্ত কুমার সুরূপাকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন—"চল গান গাইবে।"

সুরূপা বলিলেন—"গান গাইব কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে—বল রাখবে?"

সুরূপাকে অপ্রসন্ন করিবার ইচ্ছা কুমারের ছিল না। বলিলেন—"আচ্ছা রাখব।"

সুরূপা আপন তানপুরাটি নিয়া চলিলেন—সুরূপার হাত চমৎকার—সাতটী সুর পোষা পাখীর মতন তার হাতে খেলে—কণ্ঠ ও যন্ত্রের সে কি অপূর্ব্ব সমন্বয়—।

কুমার মুগ্ধচিত্তে শুনিতেছিলেন। বলিলেন—"একটা গান গাও লক্ষ্মী!"

সুরূপা গান ধরিলেন। জ্যোৎস্নার প্লাবনে বিশ্ব পুলকিত—সেই পুলকের উন্মাদনাও সঙ্গীতে জাগিয়া ওঠে।

সুরূপা গাহিলেন ঃ—

যদি ক্ষণিকের লাগি ভালবাস প্রিয়!
সে আমি চাহিনে;
যে গান ফুরায়ে যায়, হৃদয়ে রহেনা
সে গান গাহিনে!
তুমি যদি প্রিয়! কর অবহেলা,
কেমনে যাপিব দুঃখভরা বেলা?
কোমল হৃদয়ে যাতনা সহেনা—
সে কথা ভাবিনে।
ব্যথা দিলে পাবে ব্যথা, আপনি অজানা,
সে কি গো জানিনে,
যে বলে বলুক নিঠুর কঠোর তুমি,
সে কথা মানিনে।

সুর অনেক বলে। কথা যেখানে মূক, সুর সেখানে আপনাকে ব্যক্ত করে। সুরূপার ব্যথা কুমারের হৃদয় স্পর্শ করে।

কুমার বলিলেন—"সুরূপা, আমি অন্যায় করেছি—কিন্তু তুমি তোমার প্রেম দিয়ে আমাকে সঞ্জীবিত করে তোলো—আমায় আবার জীবনের সহজ পথে নিয়ে চলো……।"

কুমারের ভাবোচ্ছাস আন্তরিকতায় ঋদ্ধ, তাই তাহার নাটকীয় ভঙ্গী কাণে বাজে না—বরং হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

সুরূপার হৃদয়ে মোক্ষদার কথা জাগে।

যজ্ঞের ফল ধ্রুব ফলিবে। সন্ন্যাসীর তপস্যা অমোঘ—ব্যর্থতার ভয় নাই। তাই তিনি স্বামীকে করতলগত করিবার দুর্দ্দমনীয় আশায় মাতিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"তুমি আমায় ভালবাস, তা আমি জানি—"

কুমার জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন, বলিলেন—"ভালবাসি—না তা বোধ হয় ঠিক নয়—তবে আপোষ করতে হবে—জীবনের সঙ্গে। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না জীবনে সুরূপা! তবু সংসারের রথ চালাতে হয়।"

সুরূপা বলিলেন—"না, না, তুমি ভুল বুঝছ—তুমি ভালবাস কিন্তু…"

"কিন্তু কি?"

"রাগ করোনা—তোমার উপর দৃষ্টি পড়েছে—ডাইনির দৃষ্টি—"

কুমার স্তম্ভিত-বিস্ময়ে সুরূপার মুখের দিকে চাহেন।

পরে পদ্মার বালুচরে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহেন।

ওকি?

ওই ত সেই ছায়া? ঠিক, জ্যোৎস্নায় চোখের ভুল হয় না—যেন সিল্কের শাড়ী পরিয়া চাহিয়া আছে। চোখের যেন উদাস ম্লান দৃষ্টি। সে যেন হাতছানি দিয়া ডাকে।

স্বামীর চাঞ্চল্য দেখিয়া সুরূপা বলিলেন—"কি দেখছ!" কুমারের

চমক ভাঙে—সুরূপাকে বলেন—"ওই যে বালুচরে ওখানেই বেলার শ্মশান—সে আজ ফিরে এসেছে আমাকে ডাকছে।"

সুরূপা ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠেন, বলেন—"না, না, এসব কি পাগলামি করছ ?"

"পাগলামি নয়, ওই দেখ ঠিক আমি দেখতে পাচ্ছি—"

সুরূপা চাহিলেন—বালুচরে শঙ্কিত-দৃষ্টি মেলিলেন—"কই ? কিছুই নেই—তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছো ?"

কুমার আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন—"না এখন আর দেখতে পাচ্ছিনে—কিন্তু তোমায় ভয় দেখাচ্ছিলুম না।"

উভয়ে নীরব রহেন।

কি যেন অস্বস্তিকর নীরবতা।

খানিক পরে সুরূপা বলিলেন—"সন্ন্যাসী যজ্ঞ করেছেন—তার চরু পাঠিয়েছেন—খাবে, খেলে সব ভয় যাবে।"

কুমারের মন বিরক্ত হইয়া ওঠে। যে প্রসন্নতায় কলহ নিবৃত্তি করিতে বসিয়াছিলেন, সে প্রসন্নতা দূর হইয়া যায়। কুমার ক্রোধদীপ্তস্বরে বলেন—"তুমি কি মনে কর সুরূপা ?"

বজ্র-গম্ভীর স্বর সুরূপাকে চকিত করে। তিনি ধীরে ধীরে বলেন—"কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না—সন্ন্যাসী বলেছেন—চরু খেলে তোমার উপর ডাইনির দৃষ্টি চলে যাবে।"

"তুমি আমায় গুণ করতে চাও—সুরূপা। তুমি না লেখাপড়া শিখেছ ?"

সুরূপা লজ্জিত হইলেন—অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস ছিল না—তাই বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করো।"

"ক্ষমা! কিসের ক্ষমা? যে নারী স্বামীকে বিশ্বাস করে না—তুকতাক করে তাকে বশ করতে চায়—তাকে কিসের ক্ষমা—যাও আমায় একলা থাকতে দাও।"

সুরূপা লজ্জায় মরিয়া চলিয়া গেলেন। খানিক পরে ঠাকুর আসিয়া ডাকিল,—"বাবু খাবেন আসুন।" কুমার তাহাকে বিদায় করিলেন।

মোক্ষদা আসিল, সেও ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল।

রাত্রি বাড়ে।

ঘুমন্ত পুরীর সমস্ত নীরবতা কুমারকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে।

কুমার ভাবেন—সংসারে মানুষ শুধু দাবী করে। নিঃস্বার্থ প্রেম সে শুধু কাব্যের কথা—

দেউড়ির পাহারায় রামদীন শুধু জাগিয়া চলাফেরা করে, কিন্তু সারা রাত্রি জাগিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

সেও ঘুমাইয়া পড়ে।

নিশীথ রাতের মায়া জাগে। কুমারের মনে হয়, ছায়া-নারী ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় যেন বালুচর বাহিয়া আসে—তার আহ্বান যেন কানে ধ্বনিত হয়।

নিরাশা ব্যর্থতায় কুমার উঠিয়া যান—অলৌকিক অপরিচিতার আহ্বান তাহাকে মুগ্ধ করে।

কুমার চলেন—দেউড়িতে রামদীনের ঘুমন্ত পকেট হইতে চাবি তুলিয়া দেউড়ি খুলিয়া বাহির হন; নিরুদ্দেশ কিসের আকর্ষণে বাহির হইয়া যান—নিজেই তাহা জানেন না।

ছায়া সমুখে চলে, কুমার পিছনে চলেন।

জ্যোৎস্না ক্ষীণা—বালুচর ম্লান।

দূরে কোথায় কোনও তরুশাখে পাখী ডাকে "বৌ কথা কও" কুমার পিছনে তাকান। সুরূপার কক্ষের স্তিমিত দীপালোক নয়নে পড়ে। মনে হয় ফিরিয়া চলেন। কিন্তু কে যেন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত তাহাকে টানিয়া লয়। নদীতে জেলে ডিঙ্গিতে জেলেরা হয়ত মাছ ধরিতেছিল, সে আলো বাতাসে কাঁপিতেছিল।

কুমার যেন কার অঙ্গস্পর্শ অনুভব করেন। কে এ অশরীরি মায়া। সমস্ত শরীর ও দেহে কি যেন সাড়া জাগে।

পদ্মার কালোজল। তরঙ্গের মৃদু বিক্ষোভ—কুমার যেন কি এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত শুনিতে পান—কি যেন বিহ্বল মাদকতা জাগে,—শুনিতে পান চারিদিকে যেন মৃত্যুর বাঁশী বাজে—

ফিরিতে যান—ফিরিতে পারেন না। কে যেন ধ্রুব মৃত্যুর শান্তির মাঝে তাহাকে টানিয়া লয়। ছায়া-নারী তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে আর কেবলই যেন চলে।

ভয়ে ও আতঙ্কে কুমার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সে মুর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না।

যাহা কাব্য নহে

—এক—

পত্নীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে সুরেশ জাগিয়া আছে।—সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি ক্লান্ত চোখ দুটিকে তন্দ্রাতুর করিয়া তোলে।

গত জীবনের ছবি মনে জাগে। তরুণী সপ্তদশী লীলা—আর সে এম-এ ক্লাশের পড়ুয়া। রূপ, যৌবন, কাব্য ও গান জটলা করিয়া আসে।

বিহগ-কূজনের মত প্রেমের অশ্রান্ত গুঞ্জন। রাত্রির ভিতর অন্ততঃ দশবার জিজ্ঞাসা করে "তুমি আমায় ভালবাস?"

লীলা কৌতুক করিয়া বলে "না"। মান অভিমানের পালা চলে।

চলচ্চিত্রের ছবির মত সেই ছবি জাগে। বার বার কাণে কাণে কত যে কথা—কত যে কৌতুক, কত যে ছল, কত লুকোচুরি—এক কথায় সে ছিল কাব্য, আর—

সত্যকার জীবন—রসহীন নির্ম্মম অভিশাপ। এম-এ পাশ করিয়া আজ দশ বৎসর সুরেশ মাষ্টারি করে। তিন মাইল দূরে স্কুল—রোজ হাঁটিয়া যায়, হাঁটিয়া আসে। খাতায় লেখে পঞ্চাশ টাকা—পায় চল্লিশ। শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসনের যুগ গেছে। দিনের পর দিন ছেলেদের শিখায় গণিত, ইতিহাস, ভুগোল। লীলা চার পাঁচ ছেলের মা হইয়া শেষ সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়াছে।

কি যে রোগ, কেহ জানে না। হরকুমার কম্পাউণ্ডারি শিখিতে গিয়াছিল—সেখান হইতে ফিরিয়া H. M. B. নাম দিয়া ডাক্তার সাজিয়াছে—সাতখানি গ্রামের সে-ই ধন্বন্তরী।

তাকে তাকে ঔষধের শিশি সাজানো—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই ঔষধেই চিকিৎসা চলে। সুরেশ নিরুপায়, দূর সম্পর্কের এক পিসি ছেলেগুলিকে আগলায়—সে পত্নীর সেবা শুশ্রূষা করে।

নিদ্রায় চোখ ভাঙিয়া আসে। তবু জাগিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার যে শৌর্য্য—শরীরের আবেদনকে সে জয় করিতে পারে না। কাতর চোখ বুজিতে চায়।

না, সুরেশ আর পারে না; এমন করিয়া সেবার সৌখীনতা তাহার সহে না। ইহার চেয়ে—

ভাবিতে ও বলিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ। কিন্তু তথাপি মন ভাবে।

এত যন্ত্রণা না দিয়া লীলা মরুক।

তাহার সকল ইন্দ্রিয় বিকল হয়। মনের প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ চৈতন্যে দ্বন্দ্ব চলে, কিন্তু এই ইচ্ছাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না।

কখন যে চিন্তাস্রোতে শমতা হইয়া সে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল, সুরেশ নিজেই তাহা জানে না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে। দুঃসহ জীবনের দুর্নিবার ব্যথার কি বিপরীত ছবি।

সে গিয়াছে স্বর্গলোকে। কি সুন্দর ছবি—যেদিকে চায় সেদিকেই সুন্দরের ছড়াছড়ি। গন্ধ ও গান মনকে শীতল করে—আনন্দ অফুরন্ত, ভাণ্ডার অফুরন্ত।

সে পারিজাতের বিকচ ফুল পাড়ে, মালা করে, মালা করিয়া গলায় পরায়। কার? সে যেন লীলা—কিন্তু লীলাও নয়—চির-তরুণী চির-সুন্দরী সে—সে যেন নারীর চিরন্তন লীলা—রূপ।

লীলার আর্ত্তনাদ তাকে জাগায়। ক্ষীণ ও বেদনামথিত কণ্ঠ—"দেখ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।"

অভ্যাসমত সে ঔষধের তাকের দিকে হাত বাড়ায়—

লীলা কাতরভাবে বলে—"ঔষধ না—আমি গেলে ওদের দেখো"—বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে লীলা অচেতন হইয়া পড়ে।

মৃত্যুর অপরিচিত পদধ্বনি—

আকাশে তারা জাগে—লীলা বেলফুলের কেয়ারি করিয়াছিল তাহার গন্ধ আসে—। তবু শঙ্কায় মন ভরে।

সুরেশের ব্যাকুল বেদনায় জগতের কোনই ব্যথা নেই। সে পিসিকে ডাকে। ধীরে ধীরে জীবন মিলাইয়া যায়।

জীবন্ত খোকা-খুকুর হাহাকার—কিন্তু লীলার শবদেহ নীরব ও নিঃসাড়।

—দুই—

রমেশ বলে—"তোমার কাছে এ আশা করতে পারিনে ভাই—বৌদ্দি মরতে না মরতে—"

সসঙ্কোচ প্রশ্ন। বন্ধুর মুখের দিকে উদাস-দৃষ্টি ফেলিয়া সুরেশ বলে—"তা সত্য, কিন্তু···"

"কিন্তু কি ?"

"আমার পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে—এদের দেখে কে ? পিসি ত বাড়ী যাওয়ার নুটিস দিয়েছেন—এখন উপায় ?"

"উপায়ের কথা পরে ভাব, কিন্তু তোমার কাছে—এটা কি প্রচণ্ড নির্ম্মমতা বলে মনে হচ্ছে না ?"

সুরেশ চুপ করিয়া থাকে। বন্ধুর আনন্দ-ভাস্বর মুখের দিকে তাকায়, পরে বলে—"আমিও তোমার মত ভাবতাম, কিন্তু জান কি, সমস্তই একটা প্রচণ্ড তামাসা—"

"কি তামাসা ?"

"সমস্তই—আমাদের কাব্য ও ধর্ম্ম, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যহীন সংগ্রামের মধ্যেই জীবনের চলা ফেরা—"

"তাহলে তুমি বিয়ে করছ ?"

"করছি বই কি, খেতে পাবে না অথচ কেউ আশ্রয় দেবে না—পয়সার দাসদাসী ওদের দেখবে না—"

"তাই বিনা পয়সার দাসী আনতে যাচ্ছ—যে তোমার পদসেবাকে পুণ্য মনে করবে—এই ত ?"

সুরেশ আস্তে আস্তে বলে—"রাগ করিসনে, জীবনকে তলিয়ে দেখলে তোর অনেক কাব্যই উল্টে যাবে। ফুল যে রূপ ও গন্ধ দেয়, সে মৌমাছিকে ভুলাবার জন্য—"

রমেশ বলে—"না, তুই পণ্ডিত, তোর সঙ্গে তর্কে পারব না—কিন্তু এ কাজ একান্ত পাশবিক বলে মনে হয়।"

সুরেশ বেদনা-বিহ্বল ধীরতায় উত্তর দেয়—"আমরা যে আদবেই পশু, সে কথা ভুললে চলবে কেন ?"

"না আমি শুনতে চাই নে—পরলোক থেকে সতীলক্ষ্মী তাকিয়ে দেখবে—তার ঐকান্তিক ভালবাসার এই শেষ পরিণাম ?"

"পরলোক, জানিস ভাই—ওটা মস্ত একটা ফাঁকি—!"

রমেশ লাফাইয়া ওঠে।

সুরেশ বলে—"আমি অনুভব করেছি। লীলার রোগশয্যায় যখন সেবার

শ্রান্তি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল—আমি ওর মৃত্যু কামনা করছি—তখন স্বর্গ দেখতে পেলাম—"

রমেশের ঔৎসুক্য প্রকট হইয়া ওঠে।

"সত্য—একটুও মিথ্যে নয়। দুনিয়ার জ্বালায় পরলোক একটা মিথ্যার প্রলাপ—"

"হয়েছে, আর নয়"—বলে রমেশ বিদায় লয়।

—তিন—

বিবাহ হইয়াছে।

নববধূর নাম ক্ষমা। কিন্তু তার প্রকৃতি ঠিক উল্টা। পাঁচ পাঁচটির হাঙ্গামা মা-ই পোহাইতে পারে না—ক্ষমা না পারিলে দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েটি বড়, সেই ভাই বোনগুলিকে আগলায়।

সুরেশকে পুনরায় যৌবনের ভাণ করিতে হয়। অস্বচ্ছল সংসারেও প্রসাধন কিনিতে হয়।

কিন্তু কি উপায়?

ক্ষমার সাধ-আহ্লাদ ত আর শেষ হয় নাই।

তাই খিটিমিটি লাগে।

ছোট মেয়েটির জ্বর। অঘোর অচৈতন্য—

ক্ষমার সেদিকে দৃষ্টি নাই। অতি-দূর সম্পর্কের নিমাই আসিয়াছিল—তাহাকে লইয়া সে ফষ্টি-নষ্টি করে।

সুরেশ আসিয়া দেখে। কলহের পঙ্কিল-আবর্ত্ত জাগে।

মেয়েটি বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় যায়।

সুরেশ পারে না। অভাব ও অনটন—রোগ, শোক ও দারিদ্র্য সবাই যেন তাহার পিছনে লাগিয়াছে।

তার উপর রূপসী পত্নীর জন্য হিংসা ও সন্দেহের দাবানল।

ক্ষয় অলক্ষ্যে কবে আরম্ভ হইয়াছিল কেহ জানে না। তিলে তিলে প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিয়া সে যেদিন প্রকট হইল, সেদিন যাহা কিছু পুঁজি ছিল তাহা চিকিৎসায় নিঃশেষ হইল।

তারপর একদিন যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল। সুরেশ অতি নাবালক দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে এবং ভোগ-সমুৎসুক পত্নীকে রাখিয়া সংসার খেলায় বিদায় নিল।

নিঃসম্বল নিরুপায় সুরেশ ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখিতে পারে নাই।

সুরেশের মৃত্যু তাই আকস্মিক না হইলেও অতি নিদারুণ দুর্দৈবের মত দেখা দিল।

—চার—

সংসার যে কেবল নির্ম্মম তাহাই বা বলি কিরূপে। স্কুলের ছেলেরা শোক-সভা করিয়া নয় টাকা তের আনা চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়াছে। যে আনিয়াছিল সে চার আনা ভালমানুষি বলিয়া আদায় করিয়া নিয়া চলিল।

সংসারে সহানুভূতি আছে।

কিন্তু ক্ষমা—সে মনে করে এই জগৎ বিকট দৈত্যের বিকট অভিশাপ।

জীবনে আশা ও আনন্দের পুষ্প মুকুলিত হয় নাই।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সে। কিন্তু সেখানে অধিকারের চেয়ে সে পাইয়াছে অভাবের লাঞ্ছনা।

তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

পড়শীরা বলে—শ্রাদ্ধ কর। ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে কি হয় কে জানে? সে দিন মাধু পিসী রাতে পথে ফিরিতে গা ছম ছম করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিল। আবছায়া—কিন্তু মাধু পিসী দিব্য করিয়া বলিয়াছে—"সে সুরেশের আবছায়া।"

পড়শীদের উপদেশ—উপদেশ নয়। আদেশের মত তাহাকে মানিতে হয়। দরিদ্রের যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করিতে হয়।

ক্ষমা জগার ঠাকুমাকে বলিয়াছিল—"কিন্তু আমরা খাব কি?"

জগার ঠাকুমা জবাব দিয়াছিল—"জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দিবেন তিনি, তাই বলে কি সুরেশ জলবিন্দু না পেয়ে তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবে?"

অকাট্য-যুক্তি। তিলোৎসর্গ ও বৃষোৎসর্গ যথানিয়মে হয়।

ক্ষমার চোখে মৃত্যুর পর পড়ে অন্ধকার যবনিকা। সেখানে সে কিছুই দেখে না। তাহার প্রেম জন্মে নাই, কাজেই প্রেমের মিথ্যা কল্পনা দিয়া সে সুরেশের তৃষিত-বেদনা অনুভব করিতে পারে না।

তথাপি যুগ-যুগান্তরের সনাতন সংস্কার—ঋষিদের কল্পিত সংস্কার—তাহাকে সে বিড়ম্বনা বলিবে কোন্ দুঃসাহসে। শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদেরও শ্রাদ্ধের বাকি রহিল না কিছু।

—পাঁচ—
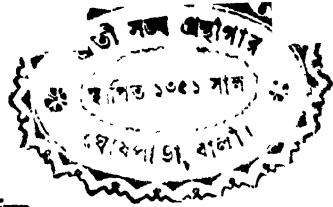
যিনি জীব দিয়াছেন তিনি আহার দেন কই, ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে রমেশ নিয়া গিয়াছে।

বড় মেয়েটি, বড় ছেলেটি—আর ক্ষমা। কচুশাক আর ভাত—তাহাও জোটান দায় হইয়া ওঠে।

পরণের কাপড় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়। কাপড় নাই—বাহির হইবার উপায় কোথায়।

উপায়—ভিক্ষা বা দাসীত্ব। কোনটাই সুলভ নহে। প্রলোভন আসে।

কামনার। আদিম কামনার, যে কামনা সমস্ত বুদ্ধিকে ব্যাহত করিয়া অপ্রতিহত হইয়া চলে—সেই জীবনের আকর্ষণ—আমার মনে সংস্কারের বেদনা জাগে।

অভাবের নির্ম্মম তাড়না সে বোধকে ক্ষীণ করে। লাঞ্ছনা আর কামনা তাহাকে যুগপৎ বিহ্বল করিয়া তোলে।

প্রলোভনই জয়লাভ করে।

প্রলোভনের পথ মসৃণ। ক্ষমা ভাসিয়া যায়।

গ্লানি আছে অবশ্য, কিন্তু হয়ত একটি আদিম পাশবিক আনন্দ আছে।

কথা কাণে কাণে প্রচার হইয়া পড়ে।

ক্ষমা ভাবে—আর ভাবে।

কেহ গালি দেয়।

"সে কেন গলায় দড়ি দিয়া মরে না?"—যে কোনও দিন ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই—গালি দিবার সময় তাহার কণ্ঠই শতমুখ হইয়া ওঠে।

ক্ষমা কথা কহে না।

কি হইবে, কি করিবে কিছুই বুঝিয়া পায় না।

কুৎসার আক্রমণ সূক্ষ্ম, কিন্তু বেদনা অতি গভীর। ক্ষমা তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

বাড়ীতে একটি আমের গাছ ছিল। সেখানে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

ফাল্গুনের আম্রমুকুলের সৌরভ হয়ত তাহার জ্বালা জুড়াইল।

রাত্রে কেহ জানিল না।

ভোরের আলো জ্বলিল। দিকে দিকে জীবনের সাড়া জাগিল। ছেলে মেয়ে দুটি উঠিয়া ক্ষমাকে দেখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মা! মা!"

অতলস্পর্শ সে কান্না।

কেহ সে কান্না শোনে না—না শোনে দুঃখীর ভগবান, না শোনে সমাজ, না শোনে রাষ্ট্র।

দিগন্ত মুখর করিয়া সে কান্না বহিয়া চলে।

নিষ্পাপ, শুচি ওই শিশু দুইটির কান্নার উত্তর কে দেয়? ভাগ্য? দুর্দ্দৈব? বিধাতা—না শয়তান?

জীবনের রথ বহিয়া চলে—আশা, আলো ও আনন্দ জাগে। কিন্তু উহাদের কান্না থামে না—; আশাহীন—অনির্ব্বাণ—নিরুত্তর বেদনা; তবু রথ থামে না—সে চলে; কে পিষ্ট হইল, কে আশ্রয় পাইল—রথ তাহা দেখে না।

চোর জামাই

—এক—

ছুটীর দিন। আকাশ ধূসর মেঘে ঢাকা। বসিয়া বসিয়া ভাল লাগে না। থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি নামে, ঝড়োহাওয়ায় টেবিলের ফুলদানী উড়াইয়া লয়। বসিয়া বসিয়া কি করি ভাবিয়া পাই না। ছাতা লইয়া দাদার বাসায় রওনা হইলাম।

এইস্থানে ভূপেনদার বিষয় কিছু বলিয়া রাখা ভাল, তিনি রক্তের সম্পর্কে আমার কেহই নন ; কিন্তু মানুষের দাবীতে সহোদরেরও অধিক। মেকির বাজারে খাঁটি সোনা চেনা দুর্ঘট বলিয়া যখন একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মানুষকে 'অবিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন বিধাতার অযাচিত করুণারই মত দাদার সহিত আমার পরিচয় হয়। নূতন স্থানে আসার কোন চিন্তাই আর আমার মনে স্থান পায় না। ভূপেনদা'র এবং বৌদি'র যত্নে বাড়ীর কথা পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছি।

সেখানে, পৌছিয়া দেখি দাদা ও বৌদি' বর্ষামঙ্গল করিতেছেন, বৌদি' পিয়ানোয় সুর ভাঁজিতেছেন, দাদা ইজিচেয়ারে বসিয়া আকাশের মেঘের খেলা দেখিতেছেন।

দাদার বৃহৎ সংসার। তিনটী ছেলে আর পাঁচটী মেয়ে। রাত্রিদিন তাহারা বাড়ী গুলজার করিয়া রাখে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত দাদাও দুহিতা-মঙ্গল' শঙ্খ বাজাইতে রাজী, তাঁহার কন্যারা পিতার উজ্জ্বল স্নেহে জীবনকে ধন্য মনে করে।

পৌঁছিয়া ডাকিলাম—“বুঁচি।”

ভাবসাগর হইতে মন ফিরাইয়া দাদা স্মিতহাস্যে আমার দিকে চাহিলেন ও বলিলেন—“ওরা কেউ বাড়ী নাই। এস সুরেশ, ব’স।”

বৌদি’ গান থামাইতেছিলেন, দাদার অনুরোধে সুরলহরী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গান শেষ হইলে দাদা বৌদি’কে বলিলেন—“এখন অতিথি সৎকার কর, বর্ষার দিনে গরম গরম পাঁপরভাজা বেশ ভাল লাগবে।”

অন্য লোক হইলে হয় ত সভ্য বনিতে হইত, বলিতে হইত—“না দাদা, এই খেয়ে আসছি, আর কেন? মাপ করতে হবে।”

কিন্তু দাদার এখানে মিথ্যাচরণের সে বালাই নাই। বৌদি’ পাঁপর ভাজিতে চলিলেন। দাদার সঙ্গে আমার গল্প চলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—“কাল গৌরী এসেছে, তাই ক্লাবে যেতে পারি নি; তারপর তোমাদের গানের মজলিস কেমন হ’ল?”

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম—“দাদা, সুরলক্ষ্মী আমার প্রতি নিতান্ত অকরুণ; সুর সপ্তকের লীলাচাতুর্য্য আমি মোটেই ধরতে পারি নি। তবে ওস্তাদী হজম না করতে পারলেও ওস্তাদীর চালবাজি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।”

দাদা গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—“দেখ, বাংলাদেশের মানুষের মনে সত্যকার দরদের চেয়ে আজ চালবাজি কাজ করে। তোমার সম্বন্ধে আমার নিরাশ হ’তে হচ্ছে, আমি যেমন অকর্ম্মা হয়ে রইলুম, তুমিও—”

কথা কাড়িয়া লইয়া উত্তর দিলাম—“তাই হোক দাদা, আপনার মত হ’তে যদি পারি, আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। ভড়ং আর ফাঁকি দিয়ে আমি জয়ী হতে চাই না।”

“যাক্, তারপর তোমার ওস্তাদের কথা ত খুব জোরগলায় সবাই বলছে যে, বাংলাদেশে এমন গাইয়ে খুব কম।”

"সে কথা ঠিক, গলার জোর থাকলেই চলে দাদা, আমি ত শুধু দাঁত-খিচুনি দেখেছি, আর মাঝে মাঝে ওস্তাদীপনা 'হো' শুনেছি। গানের কলি শেষ হ'তে না হ'তে গায়ক সেই যে বিকট 'হো' ক'রে প্রশংসাসূচকভাবে তালটিকে অভ্যর্থনা করে, তা' দেখে ত আমার হাসি চাপাই দায় হয়েছিল। আমাদের আর্টিষ্ট হরেন দা' ত মাথা নেড়ে আর রাগিনী ফরমাস ক'রে খুবই বাহবা দিচ্ছিলেন। শচীনাথও খুবই মাথা দোলাচ্ছিল।"

বৌদি পাঁপর লইয়া আসিলেন। তারপর দু'খানি ডিসে পাঁপর সাজাইয়া দিয়া পাশে চেয়ার লইয়া বসিলেন।

খাওয়ার মাঝে বৌদি' জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনেছ ঠাকুরপো, 'পচা' নামে একটা চোর সহরে বড় উৎপাত আরম্ভ ক'রেছে ?"

সংসারে খুঁটিনাটি নিয়ে থাকা আমার ধাতুসহ নহে, কিন্তু দাদা ও বৌদি' সহরের গেজেট। সকলের সহিত তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ ; সকলের খবরই তাঁহাদের ওখানে মেলে।

আমি বলিলাম—"কাল ক্লাবে কে যেন বলছিল, পুলিশ না কি বেটাকে চালান দেওয়ার চেষ্টায় আছে। সেদিন জেল থেকে বেরিয়েছে, পুরাণ-পাপী ; কিন্তু এখনো ওর ঘাড়ে দোষ চাপান যায়, এমন কিছু পায় নি। সহরের লোক নাকি ভয়ে অস্থির।"

বৌদি' বলিলেন—"অস্থির হবে বই কি ? সেটা ত কম পাজি নয়, কাল হারাণবাবুর বৌ বলছিলেন—তাঁদের পাশের বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় এসে পচা-চোর একটা হার নিয়ে পালিয়েছে। সাবধানে থাকবে ঠাকুরপো।"

দাদাও সুরে সুর ধরিলেন—"না ভাই, সাবধানের মার নেই, আমি ত জজ সাহেবের বন্দুকটা কিনেছি, দেখবে ?"

দাদা বন্দুক বাহির করিতে চলিলেন। দাদার ছেলেমেয়ে তখন সদলবলে বাড়ী পৌঁছিল। গৌরী দাদার বড় মেয়ে। আমি গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—“কেমন শাশুড়ী হয়েছে গৌরী।”

গৌরী লজ্জাজড়িত পুলকভরে কহিল—“যান্, আপনি বড় দুষ্ট কাকাবাবু।”

বুঁচি আসিয়া বলিল—“কাকাবাবু, কাকীমা আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।”

আমি বলিলাম—“যাও, মিথ্যে কথা।”

বুঁচি সেমিজের তলা হইতে লব্ধ উপহার দেখাইয়া বলিল—“না কাকাবাবু, এই দেখুন না কাকীমা আমায় সন্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যদি না বলি, তা' হ'লে সন্দেশ আর দেবেন না বলেছেন।”

বর্ষা-সন্ধ্যায় মৌনতা প্রিয়ার ভাল লাগিতেছে না বুঝিলাম। দাদার বন্দুক আনা হইলে, তাড়াতাড়ি বন্দুক দেখা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিলাম।

—দুই—

দাদার সহিত কয়েক দিন দেখা হয় নাই।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে দেখা। দাদা বলিলেন—“চল সুরেশ, আমার বাসায় যাবে।”

আমি বলিলাম—“দু'-এক হাত ব্রিজ খেলা হবে না?”

দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“না। চল, ব্রিজ খেলার চেয়ে মজার কথা তোমায় শোনাব।”

কাজেই পরম প্রিয় খেলা ছাড়িয়া দাদার অনুবর্ত্তী হইলাম।

দাদা আরম্ভ করিলেন—"আমার জামাই ভোলানাথকে তুমি ত জান ?"

আমি বলিলাম—"খুবই চিনি।"

ভোলানাথকে চিনিবার বিশেষ কারণ ছিল। দাদার মেয়ে গৌরীর শ্বশুর সেকেলে মানুষ। গৌরীকে যখন দেখিতে আসেন, তখন গৌরী হাঁটুর উপর পড়া ফ্রক পরিয়া চুল ছাড়িয়া দিয়া রাস্তায় হল্লা করিতেছিল, তিনি আমায় তাই বলিয়াছিলেন—"না বাপু, এসব আমাদের নিকট দৃষ্টিকটু—এই সমস্ত উলঙ্গ বিবিয়ানা আমাদের চোখে সয় না।"

দাদা সব শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম—"দাদা, জামাইকে দেখে যেতে বলুন, তা'হ'লে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।" এ যুক্তি ফলপ্রদ হইয়াছিল।

দাদা বলিতে লাগিলেন—"পরশু শুক্লা প্রতিপদ গেছে—সারা দিন-রাত বর্ষা হয়েছিল; রাত্রে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। রাত দু'টায় যে গাড়ী কোলকাতা থেকে আসে, সেই গাড়ীতে জামাই বাবাজীবন এসেছেন। খবর নেই, বার্ত্তা নেই, কাজেই কেউ কিছু জানি না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"প্রথম বয়সে আর প্রথম প্রণয়ে এরূপ একটু-আধটু হয়।"

"তা' হয় বই কি। জামাই বাবাজী ত এক রিক্সা ক'রে এসেছেন—এসে হয় ত আমাদের দু-একবার ডেকেছিল, কিন্তু সাড়াশব্দ না পেয়ে যে ঘরে গৌরী শোয়, তার কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাকে ডেকেছে। আমার হল-ঘরের পাশেই ওরা কয় বোনে রাতে শোয়। মাথার জানালা বরাবরই খোলা থাকে। সাড়া না পেয়ে জামাই বাবাজী গৌরীর শাড়ীর আঁচল ধরে' টান দিয়েছেন।

সেদিন চোরের গল্প শুনে ওদের—ঐ যে কি বল অবচেতন মনে ভয়ের বীজ ছড়ানো ছিল। আঁচলে টান পড়্তেই গৌরী ভয়ে চীৎকার করে উঠেছে। জামাই তখন জানালার ফাঁকে হাত-ছানি দিয়ে বারণ করে।

ঘরের ভিতর নিভু নিভু করা বাতি জ্বলছিল—গৌরী ভাবল চোর ছোরা মারতে চাচ্ছে। কাজেই আতঙ্কে সে 'চোর চোর' বলে' আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। তখন বুঁচি, ফেলী, পারুল, সেজুড়ী সবাই সমস্বরে চীৎকার করে ডাকছে—"চোর। চোর।"

তোমার বৌদি' আমায় গা নাড়া দিয়ে বললেন,—"ও গো, শুনছ ?" নির্ভর-নিদ্রাসুপ্ত আমার সাড়া পাওয়াই ভার। ঘুম ভাঙ্গলেও কি ব্যাপার হয়েছে বুঝতে না পেরে হতভম্ভ হয়ে যাই। যখন ব্যাপার বোঝা গেল, তখন সজাগ হ'য়ে পৌরুষ দেখাবার সঙ্কল্প করলুম।

জামাই বাবাজী বারান্দায় এসে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে বলছিল, —"আমি ভোলা।"

কিন্তু সোরগোলের মধ্যে আর ভোলানাথের লজ্জাবিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা বুঝতে পারলুম না। তোমার বৌদি' ভয়ে ভয়ে বলিল,—"ও বোধ হয় পচা চোর।"

আমি ভৃত্য জলধরকে ডাকতে লাগলুম,—"ওরে জলা, বন্দুক নিয়ে আয়। জলধরের চেহারা যেমন ভূতের মত, বুদ্ধিতেও তেমনি হাঁদাকান্ত। ঘুম তার কিছুতেই ভাঙ্গে না। সোরগোলের শেষে যখন বন্দুক এসে উপস্থিত হ'ল, তখন চোর পলাতক দরজা খুলে বাইরে আমরা সবাই বসলাম, আলো টর্চ্চ আর লাঠি নিয়ে জলধর, ঠাকুর, পাশের বাড়ীর ঠাকুর ও চাকর সবাই বার হয়ে পড়ল।

—তিন—
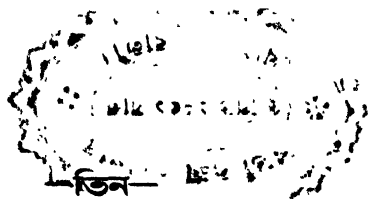
রাত প্রায় শেষ হয়েছে বলে' বারান্দায় বসে জটলা আরম্ভ করা গেল। বুঁচি বললে,—"বাবা, চোরটার যা' চেহারা যেন কালো এক যমদূত !"

সেজুড়ি ভয়ে তখনও কাঁপছিল। সে আস্তে আস্তে বলল—"আচ্ছা দিদি, চোরটার চোখ দুটো যেন ভাঁটার মত জ্বলছিল, না ?"

গৌরী উত্তর দিল—"চোর বাছাধন আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছে। ভাবছিল, বুঝি ছোরা দেখিয়ে আমায় ভুলোবে ; আমি যেন তেমনি মেয়ে !"

বুঁচি বলল—"কিন্তু দিদি, ওর ছোরা যেমন ধারালো, তাতে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছিল—"

—"ভয় না ভয়, আমার হাতের কাছে লাঠি থাকলে আমি এমন খোঁচা মারতুম যে, গুণ্ডাটার থোতা নাক ভোঁতা হয়ে যেত।"

দাদা বলিলেন—"গৌরীর সাহসের কথা শুনে তোমার বৌদি' মনে মনে খুসী ; কারণ আসলে তিনি বড়ই ভীতু—তাই সাহসের কাহিনী শুনলে তিনি খুসী হয়ে ওঠেন। তোমার বৌদি তখন বললে—'আজও বেশ শিক্ষা হ'ল, রাত' দশটা-বারটা যে বন্ধুদের দল নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াও, এখন বুঝলে বাড়ী সকাল সকাল আসতে কেন বলি, আপদ-বিপদ কখন যে কি হয়, কে বলতে পারে' ?"

আমি চুপ করে থাকা শ্রেয় মনে করলাম।

জামাই বাবাজী বন্দুকের কথা শুনে বাইরের উঠানের আম গাছের পাশে লুকিয়ে ছিলেন। জলধর খুঁজতে খুঁজতে দেখা পেয়ে বলল—"শড়া চোর।"

ভোলানাথ বলল,—"জলধর, আমি জামাইবাবু।"

জলধর তখন সসম্ভ্রমে চোরকে নিয়ে এল; চোর ধরা পড়েছে ভেবে বুঁচির দল মহা উৎসাহী।

ভোলানাথকে দেখতে পেয়ে গৌরী লজ্জায় দে ছুট। তোমার বৌদিও' ঘোমটা টেনে দিয়ে হাসতে হাসতে অন্তঃপুরে পলায়ন করলে।

আমি লজ্জা-পাণ্ডুর জামাতাকে বললাম—"এস, বাড়ীর সব ভাল ত?"

পায়ের ধুলো নিয়ে ভোলানাথ উত্তর দিল—"হাঁ, ভাল! কলেজে আমারা শিল্ড পেয়েছি, তাই সাত দিনের ছুটী।"

সেজুড়ি বলল—"সাতদিন দাদাবাবু!"

বুঁচি বলল—"কি মজা!"

কথা বলিতে বলিতে দাদার বাড়ী আসিয়া পড়িলাম। দাদা বৌদিকে পেটুক ঠাকুরপোর উপস্থিতি জানাইতে গেলেন। গৌরী তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া পিয়ানোয় সুর দিয়া গাহিতেছিল—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর!"

গৌরীর বিবিয়ানার চেয়ে গৌরীর গান ভোলানাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সত্যকার আবেগ দিয়া ভাব-মধুর গান গৌরী গাহিতেছিল। সুর, লয় ও তালের সমন্বয়ে যেন চারিদিকে রসলোকের মাধুর্য্য বিতরিত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—"ও গান কেন গৌরী!"

গৌরী লজ্জাবিনম্রকণ্ঠে উত্তর দিল—"কেন কাকাবাবু, এ গান ত আপনার বেশ লাগে অনেকদিন বলেছেন।"

—"বলতে পারো মা, কিন্তু মত না বদলালে ত আর মস্ত জিনিয়াস হওয়া চলে না।"

—"বেশ, আপনি যে গান ফরমাস করেন, সেই গান গাইব।"

—"গাইবে ত লক্ষ্মী! এটা নূতন রচনা, তোমার গানের সুরেই গাওয়া যাবে।"

উদগ্র হইয়া গৌরী বলিল—"বা! বলুন না কাকাবাবু—"

আমি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম—"তবে শোন—"

"এই দেখিনু রঙ্গ তব, তস্কর হে তস্কর!
তৃপ্ত হ'ল চিত্ত মম দৃপ্ত হ'ল অন্তর,
তস্কর হে তস্কর!"

গৌরী পিয়ানো ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিল, লজ্জায় ও ক্ষোভে চীৎকার করিয়া বলিল,—"কাকাবাবু! আপনাকে মেরে ফেলবো—"

"মেরে ফেলবে কেমন ক'রে মা! আমি বাবা ভোলানাথের শরণাপন্ন হ'ব।"

গৌরী ত্রস্তে পলায়ন করিল। বুঁচি সেজুড়ীর দল হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।

স্বপ্ন

"তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু সত্যি—?"

ইরা রোগক্ষীণ কণ্ঠে বলিল। স্বামী নরেশ আধুনিক—অতীতের কুসংস্কার সে মানে না—সে শান্তকণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়।

"সত্যি না হয় নাই হোক, কিন্তু তোমার কাছে সত্য হলেই হল।"

"তবু অবিশ্বাস, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলাম চলে গেছি—নদীর ধারে শ্যামল ঘাসের বিথার তার পাশে পাশে ফুল ফুটেছে—"

"আর ফুল পরীরা খেলা করছে এই ত?"

"সত্যি তাহলে তুমি জান দেখছি—"

"জানি না, কিন্তু এই মিথ্যে কথা মানুষ অনেকদিন ধরে ভেবেছে—।"

ইরা স্বামীর হাত আপন রোগতপ্ত বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে, পরে বলে —"তুমি আমায় ভালবাস ত?"

"কেন?"

"বল না?"

"আচ্ছা ভালবাসি।"

"আচ্ছা কেন?"

"ভালবাসা ঠিক কিনা জানি না—ওটাও হয়ত একটা নিছক কল্পনা—"

"না, না তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ো না—আমি বলছি ভালবাসা আছে, স্বর্গ আছে—সব সত্য, আবার আমরা মিলব।"

"বেশ।"

"বেশ কেন? তুমি ঠিক জেনো—স্বর্গের নন্দন বনে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব—"

"করবে?"

"করবো।"

"তা হলে করো। কিন্তু আমি ওটাকে সত্যি মানতে পারিনে—"

"বল কি?"

নরেশ ইরার ক্ষীণ দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে—"রাগ করো না কিন্তু, তোমার মনের সারল্য নেই কি করব বল ত?"

"বিশ্বাস করো—শান্তি পাবে, আমি গেলে কাঁদবে না—"

"যাও, আবার চালাকি করে? ডাক্তার বলেছে তুমি শীঘ্রই ভাল হবে—"

"ভাল হবো, কিন্তু একেবারেই ভাল হবো—সংসারের দুঃখ জ্বালা সব জুড়িয়ে যাবে—"

"তোমার কথা সত্যি কিনা জানি না, কিন্তু এটা ঠিক তুমি যদি ম'রে পরী হও, তাহলে এ কাঙালের জন্য দুঃখিত হবে না—পরীরাজ্যে বরের অভাব হবে না।"

"অমন কথা বলো না বলছি।"

"সত্যি, কথা শুনলে রাগ হয়—তুমি কি জান তোমার মেনু বিড়ালটির ভাবনা কি? পরী হ'লে তোমার মনের সব আশা ভরসা বদলে যাবে।"

"যাবে না, যাবে না, আমি চাঁদনি রাতে তোমার ঐ চাঁপা গাছের ডালে বসে দেখব, তুমি ঘুমিয়ে আছ—খোকা কাঁদবে তুমি তাকে সান্ত্বনা করছ—"

"লোকে তা হলে পেত্নীর ভয়ে এ পাড়া ছাড়বে—"

"তুমি তা হলে মাননা—"

"না মানিনে, কিন্তু সে তর্ক এখন যাক, তুমি ঘুমোও।"

ইরা চুপ করিয়া চোখ বোজে। নরেশ পাশেই বসিয়া রহে। অতন্দ্র জাগরণ—মৃত্যুর বাঁশী আসে, দূরে তার অস্পষ্ট ধ্বনি বাজে।

নরেশ তবু নির্ভীক। তৈলহীন দীপশিখার মত ইরা দু'তিন দিন একটু জীবনের স্পর্শ পাইয়াছিল তাহারই জ্যোতি, কিন্তু পিছনে মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকা।

তন্দ্রাকাতর নরেশ পিছনের দেওয়ালে মাথা ঠেস দিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না। ইরার কথাবার্ত্তা তাহার মস্তিষ্কে কেবলই ঘোরাফেরা করিতেছিল—সে যেন ফিরিয়া গিয়াছে মানব সভ্যতার প্রথম উষাতে। সমুদ্রের বেলাভূমে তরঙ্গের অবাধ গর্জ্জন, বন্য-তরুর ডাল দিয়া নীড় বাঁধিয়াছে তরুণ ও তরুণী। হিংস্র ব্যাঘ্র আসিয়া পত্নীকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিল। তরুণ ভয়কম্পিতস্বরে ব্যাঘ্রের অর্চ্চনা করিল। "হে করাল! হে রুদ্র প্রসন্ন হও।"

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল—পাহাড়ের ধারে দল বাঁধিয়া নর ও নারী বাসা বাঁধিয়াছে। বনের ফল ও পশুই তার খাদ্য যোগায়। বরফের পাহাড় নামিয়া আসিয়া ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করিল। যাহারা বাঁচিল তাহারা মৃতকে কবর দিল—তার পর শোকের পাথেয় দিল।

আবার পট বদলাইল—নদীর তীরে মানুষ—মাঠে হল চলিতেছে, নদীতে নৌকা। নদী চলিয়াছে—কোন দূর দিগন্তরে কে জানে? মানুষ ভাবে এই নদীর মতই তার জীবনের গতি অনন্ত ও অফুরন্ত। নরেশ শোনে নদীর তীরে

কবির কণ্ঠ। কবি গান বাঁধেন আশা ও আনন্দের—এই জীবনের দুঃখের পারে আলোক ও পুলকের দোতনার কথা তার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত।

কল্পনার শৈশব কি সুন্দর! নরেশের অর্দ্ধসুপ্ত চৈতন্য তর্ক করে—কল্পনা মিথ্যা। এই বিশ্বজগতের মাঝে মানুষের জগৎ একান্ত ক্ষুদ্র। মানুষের স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্যের সাথে আর সংস্পর্শ নাই।

নিদ্রার মাঝেও তুমুল তর্ক চলে।

*　　*　　*　　*

ইরার ক্ষীণ কণ্ঠ জাগে "জল"।

নরেশের তন্দ্রা ভাঙে না। পাশের ঘরে নরেশের মা ঘুমান—রোগিণীর হাহাকার তাহাকে জাগায়।

বুড়ী আসিয়া জল দেন—

"জ্বলছে মা বুক বড় জ্বলছে।"

বুড়ী ভাজুয়কে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া রোগিণীকে বাতাস করিতে থাকেন।

ইরার যন্ত্রণা বাড়ে।

দীর্ঘকালপ্যাপী রোগ। বুড়ী মৃত্যুর আক্রমণ বোঝেন না। ইরার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া ওঠে।

বুড়ী ডাকেন—"নরেশ! নরেশ!"

বিহ্বলা মাতা—পুত্রের কাতর নিদ্রায় জাগাইতেও ইচ্ছা নাই, আবার বধূর অবস্থা তেমন বুঝিতেও পারেন না—

ইরা কাঁপিতে থাকে। প্রাণের পলায়নের শেষ বেদনা—বুড়ী অস্থির হইয়া পড়েন।

ডাক্তারের পায়ের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু মৃত্যুর রথ আসিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলেন "মা উপায় নাই।"

বুড়ী ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠেন।

ডাক্তার ডাকেন—"নরেশ, নরেশ।"

অবসন্ন নরেশ তন্দ্রার মধ্য হইতে বলে—স্বপ্ন—জীবন মৃত্যু প্রচণ্ড স্বপ্ন। ফাঁকি, মস্ত একটা ফাঁকি।

জাগিয়া খানিক চকিত হইয়া চায়, তার পর মুহূর্ত্তেই ব্যাপার বুঝিয়া ইরাকে জড়াইয়া ধরে—ডাকে আবেগভরা সুরে—ইরা! ইরা!

* * * *

শ্মশানে চুল্লী জ্বলে।

নরেশ নির্ব্বাক নিস্পন্দ। মনে ঝঞ্ঝা ও ঝড় বহে—তর্ক, বেদনা মিশিয়া বিহ্বলতার সৃষ্টি করে।

কুহেলিকা, দুর্ভেদ্য কুহেলিকা—যুগযুগান্তরের সমস্ত পাণ্ডিত্য এখানে স্তব্ধ।

রূপ, হাসি ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আশা?

মৃত্যুর তীরে স্বপ্নের রথে মানুষ চড়ে—আশা করে যা গেল তা শেষ নয়। শেষের মাঝে অশেষ আছে।

নরেশ প্রশ্ন করে—"ডাক্তার তুমি পুনর্জন্ম মান?"

ডাক্তার প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না—অবাক হইয়া বক্তার মুখে দিকে চাহে, বলে—"জানি নি ত ভাই, তবে সকলে বলে।"

নরেশ অট্টহাসি হাসিয়া ওঠে—"না ভাই একান্তই ফাঁকি, জীবনটা একটা প্রচণ্ড ফাঁকি এর আদ্যন্ত শুধু গতি। এখানে আশা নেই, ভাষা নেই, শুধু দ্বন্দ্ব, শুধু সংগ্রাম। জীবনটা একটা প্রচণ্ড নিরর্থ স্বপ্ন।"

ডাক্তার চুপ করিয়া রহে। নরেশ জোরে বলে—"স্বপ্ন, বাস্তবিকই একটা বিকট স্বপ্ন।" চুল্লীর আগুণ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে—বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগে—স্বপ্ন—স্বপ্ন।

পরিত্যক্তা
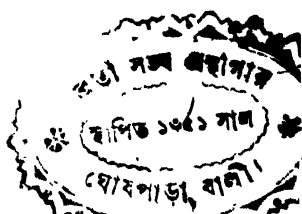
—এক—

বর্ষার দিন। ভাদ্র মাসের শীতার্ত্ত বাতাসে একলা ঘরে বসিয়া মেঘের ধূসর বিষণ্ণতা আর জল-ধারার ভঙ্গিমা দেখিতেছিলাম। "এলামণ্ডার" গাছে হলুদ ফুলের রাশি ফুটিয়াছে থরে থরে, খোকন আসিয়া বলিল,—"বাবা, ফুল নেবো।"

শিশুর সরল মন—বৃষ্টিধারার বাধা তার কল্পনায় আসে না! কাজেই তাকে নিরুৎসাহ করিতে পারিলাম না। ভিজিতে ভিজিতে ফুল তুলিয়া শিশুদেবতাকে অর্ঘ দিলাম।

কাণে আসিল,—"বর্ষায় যে একবারে ভিজে গিয়েছ!"

চাহিয়া দেখি, ধূপ-ছায়া শাড়ী পরিয়া বিজয়িনী মূর্ত্তিতে উমা। অতি-প্রসন্নতার হেতু বুঝিলাম না।

উমা বলিল, "আজ মিসেস সেন এসেছিলেন—মেয়েদের একটা টেনিস ক্লাব তিনি খুলতে চান। আমাদেরও খেলতে বলেছেন।"

অতর্কিত পথিক পথে সর্প দেখিলে যেমন চমকিত হয়, উমার প্রস্তাব শুনিয়া তেমনই চমকিত হইলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া উমা প্রশ্ন করিল, —"কি! কথা বলছ না যে?"

"ভাবছি!"

"কি ভাবছ?"

"তোমাদের গতি যে ছন্দে চলছে, তার সঙ্গে আমরা তাল দিয়ে উঠতে পারছিনে।"

"তার মানে—তোমরা আমাদের দাসী ক'রে রাখতে চাও?"

"তোমাদের আমরা দাসী করিনি। তোমাদের প্রকৃতিই তোমাদিগকে দাসী করেছে।"

"না, না। তোমার এ সব পুরানো যুক্তি আর চলবে না। মিসেস সেন বলছিলেন, বাঙ্গালার নারীকেও বিশ্বের নারী-দরবারে আসন নিতে হবে। রাঁধুনীগিরি যথেষ্ট করেছি, আর নয়।"

"থাক! এ সব তর্ক ক'রে এই বাদল-বেলাকে নষ্ট করতে চাইনে। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি মিসেস সেনের সঙ্গে মিশো না।"

উমা হাস্য-প্রসন্ন কঠোরতার সহিত বলিল—"তা বুঝেছি। তোমরা সইতে পারবে না।"

"না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমার লেখায় আমি ভারতীয় নারীর অতীত আদর্শের জয়-গান করছি, তা ব'লে আমি একান্ত-মনে নারী-প্রগতির পক্ষপাতী।"

"তা হ'লে এখানে বাধা দিতে চাইছ কেন?"

"সেটা হয় ত কবিজনোচিত ভদ্রতা বশতঃ কিন্তু থাক্, সে কথা শুনে লাভ নেই জেনো, আমার একান্ত মিনতি, শুধু অনুরোধ নয়।

অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে উমা বলিল,—"বেশ! আমি তা হ'লে তোমার পর?"

"পর কি আপন, তা কেমন ক'রে বলি? কিন্তু অপ্রিয় কথা নাই শুনলে।"

"না বলো।"

"তুমি হয় ত আভাকে জানো—আমাদের গাঁয়েরই মেয়ে—"

"আভা-দির কথা বলছ! রায়েদের মেয়ে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

আমি একটু উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম,—"তোমাদের ঈর্ষার বিষ কি কিছুতেই নিঃশেষ হয় না, উমা ?

উমা অপ্রতিভ হইল, বলিল,—"বাস, আমি কি বলেছি যে, তুমি তাকে ভালবাস ? এ ঠাকুর ঘরে কে—আমি কলা খাইনি গোছের হ'ল।"

"তা নয়, উমা, তুমি কি জান না আভার দুরবস্থা ?"

"না।"

"তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী এখন পদস্থ ভদ্রলোক ; কিন্তু আভাকে ত্যাগ ক'রে তিনি অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আভা এখন তার দুঃখ-দুর্গম দিন একলা বহন করছে—স্বামি-পরিত্যক্তা হয়ে—"

"আমায় মাপ কর,—আমি জানতুম না।"

উমার উদার অন্তঃকরণ বেদনায় উচ্ছল হইয়া উঠিল।

"তোমার, আভাদির জন্যই বলছি—তুমি ওদের সঙ্গে মিশো না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ভাদ্রের মেঘলা আকাশের কি বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি। এমনই হতভাগ্য বিষণ্ণ তার জীবন !"

উমা কাতর স্বরে প্রশ্ন করিল—"কিন্তু আভাদির সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ ?"

"শুনবে ? তবে চল ড্রয়িং-রুমে বসবে। বাইরে ব'সে এ সব কথা বলা চলে না।"
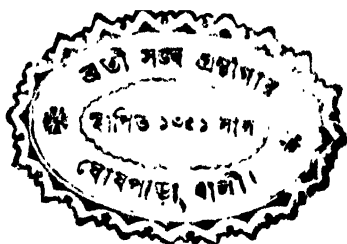
—দুই—

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া বলিলাম—"উমা, তুমি একটা গান গাও, আমার মনটাকে সুস্থির ক'রে নিই।"

উমা বলিল, "না না। তুমি দেখছি ভয়ঙ্কর লোক। সে-কথা শোনবার জন্য মন ব্যাকুল—এখন কি গান গাইতে পারি?"

খোকা কোথায় পলাইয়া এলামগুা কুচি-কুচি করিতেছিল—আসিয়া উমার আঁচল ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি গান গাইবে?"

উমা খোকাকে আদর করিয়া বলিল, "তুমি একটা গাও না বাবা!"

খোকা মাথা দুলাইয়া বলিল, "না।" পরে আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিল, "মা, আমি গান শিখেছি। কলের গান জান মা?"

"কি বল দেখি?"

"রাখালেরা বাজায় বাঁশী বটতলাতে,
আজকে আমি যাব না মা পাঠশালাতে।"

খোকার কণ্ঠে গান বেশ মধুর শুনাইল। ঝি আসিয়া ডাকিল, "এস খোকন দুধ খাবে।"

সে অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "না, তোর কাছে খাব না—মোহনের কাছে খাব।"

মোহন বালক ভৃত্য। সে আসিয়া খোকনকে লইয়া গেল।

উমা বলিল—"এখন আমি গান গাইতে পারব না। বল, কি বলবে?"

আমি বলিলাম, "উমা, তুমি বিদ্যাপতি পড়েছ?"

"কেন?"

"সেই কবিতাটা আমার কেবলই মনে পড়ে—

'এ মাহ ভাদর,
ভরা বাদর,
শূন্য মন্দির মোর।'

আভার কথা যখন ভাবি, তখন বিদ্যাপতির এই কবিতা যেন মূর্ত্তি ধ'রে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

উমা বলিল—"কিন্তু কবিতার ব্যাখ্যা রাখ। কি ঘটনা, বল না?"

আমি আরম্ভ করিলাম :—

"সুরেশ গরীবের ছেলে ছিল। ছোট বয়সে পড়াশুনার জন্য ওকে অনেক কষ্ট পোহা'তে হয়। অল্পবয়সে সে মাতৃহীন হয়। তার বাবা আবার বিয়ে করেন।

বিমাতার হাতে সুরেশ যথেষ্ট লাঞ্ছনা পেত, কিন্তু সুবোধ শিশুর মত সে লাঞ্ছনা উপেক্ষা ক'রে সে খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করত।

সুরেশ যখন ম্যাট্রিকুলেশন পড়ছে, তখন ওর বাপ আভার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

ওর বাপ ছিলেন কৃপণ—পয়সার লোভে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। আভার বাপ মেধাবী ব'লে সুরেশকে খুব পছন্দ করলেন, আর বিদেশে থাকতেন ব'লে সুরেশের গৃহের দুরবস্থার কথা বিশেষ কিছু জানতেন না।

আভার পিতা কিছু নগদ টাকা নিয়ে দেশে আসেন, কাযেই সুরেশের বাপ আভার বাপকে বেশ ক'রে দোহন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সুরেশ বরাবর বৃত্তি নিয়ে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে নিলে। পড়ার দিকে অত্যধিক আসক্তি হয় ত আভা আর সুরেশের মাঝে প্রণয়ের মধুচক্র রচনা করতে দেয়নি।"

উমা বাধা দিয়া বলিল, "বল কি, পড়বার সময় তোমার নিজের পাগলামির কথাগুলি স্মরণ করলে এটাকে বিশ্বাস করতে মন সরে না।"

আমি উত্তর দিলাম, "তা নয় উমা—এর ভিতর মনস্তত্ত্বের গভীর কথা আছে। মেয়েরা ভালবাসতে জানে না—পুরুষই ভালবাসা দেয়। তার ভালবাসার রং দিয়েই পুরুষ নারীকে মহিমান্বিত ক'রে গ'ড়ে তোলে।"

উমার মুখখানি কালো মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম, "এ আমার কথা বলছিনে উমা, এসব বৈজ্ঞানিকের কথা। এর মধ্যে কাব্য নেই। তুমি যদি এমন অবুঝ হও, তা হ'লে গল্প বন্ধ করি।"

"না না, বল কি হ'ল তার পর?"

সুরেশের পড়ার নেশা তার মনে যৌবনের বাঁশী বাজায় নি। তার মনে লেখা-পড়া শিখে বড় হওয়ার ঝোঁক ছিল সব চেয়ে বেশী। সুরেশ যেবার বি-এ পাশ করলে, সেবারই ভারতবর্ষে আই, সি, এস পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। সুরেশ পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প করল, বাপের কাছ থেকে কোন উৎসাহ পেল না; কিন্তু ওর সতীর্থরা ওকে খুব সাহায্য করেছিল।

সুরেশ আই, সি, এস হয়ে ওর বন্ধুদের মুখ-রক্ষা করল। কিন্তু বিলাত যাওয়ার জন্য ওর দু-তিন হাজার টাকার দরকার হ'ল—বাপ ছেলেকে কিছুই দিতে চান না।

এমন সময় সুরেশের সঙ্গে মীরা গুপ্তর বাপের পরিচয় হ'ল। তিনি সদরালা ছিলেন। হাতে পাওয়া লক্ষ্মীকে ছাড়তে নারাজ হয়ে সুরেশ মীরা গুপ্তর বাপের দ্বারস্থ হ'ল তিনি আপন-কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করবার সুযোগ হারাতে চাইলেন না—নিরুপায় সুরেশ মীরাকে বিয়ে করল। বিয়ে ক'রে বিলেত চ'লে গেল।

আভা এই খবর পেয়ে একান্ত বিরূপ হয়ে উঠল। সে ঠাকুরপূজা নিয়ে মাতলো।"

সংসারে স্বামীর আদর সে পায়নি—তাই আঘাত যখন এল, তখন সে একটা অবলম্বন চাইল—সে অবলম্বন পেলে সে পূজা অর্চ্চনায়।

সুরেশ ফিরে এসে আভার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল। যে দিন ও যায়, আমি সে দিন আভাদের বাড়ীতে ছিলুম। আভা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে বলল, 'তুমি তোমার ভালবাসার পাত্রকে নিয়ে সুখে থাক, তোমার সংস্পর্শে আমার কোন প্রয়োজন নেই।' সুরেশ অনেক সাধা-সাধনা করেছিল, কিন্তু জেদী আভা কিছুতেই রাজি হয়নি। আভার বাপ ম'রে গিয়েছেন। অনেক কষ্টে আভাকে অন্ন সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু তবু সুরেশের কাছে কোন দাবী-দাওয়া সে রাখে না।

আভার এই জেদের মূল হয় ত ঈর্ষা। কারণ, মীরা তরুণী এবং নব্যা। সুরেশের মনে যখন প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, মীরা এসে সেই প্রেমের ক্ষুধা মেটায়।

এই সুরেশই তোমার মিঃ সেন আর মীরা মিসেস সেন। তাই বলছি ওদের সঙ্গে তুমি মিশো না।"

—তিন—

বর্ষা ক্ষণেকের জন্য থামিয়াছিল। পুনরায় গুরু-গম্ভীর শব্দে নামিল। উমা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কিন্তু মিসেস সেনের দোষ কি?"

"তা বলিনি, আর বলাও বোধ হয় শোভন হবে না। কিন্তু মীরা তার ফাঁদ দিয়ে সুরেশকে বেঁধেছিল। মীরা একবারে আধুনিক—তা তার

প্রস্তাব শুনেই বুঝতে পারছ। সুরেশই দোষী। কারণ, শত প্রলোভনেও বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা তার উচিত হয়নি। কিন্তু তার অধঃপতনের মূলে ছিল মীরার হৃদয়-জয়ী যৌবনশ্রীর অস্ত্র।"

"কিন্তু আভার কি কোনও দোষ নেই?"

"কি দোষ—বল? তুমি যদি তার অবস্থায় পড়তে, তা হ'লে কি করতে সপত্নীর প্রণয়-বিলাসে করঙ্ক-বাহিনী পত্রলেখার কাজ করতে পারতে না, এ কথা সত্য। আভা বঞ্চিতা—আভা অভাগিনী—কিন্তু সে দুর্ভাগ্যের মূল?"

উমা বলিল—"ভাগ্যের বিড়ম্বনা।"

"না, না, ভাগ্যকে অত মেনো না। আভাকে আমি একান্ত প্রশংসা করি। আমাদের দেশের মেয়েরা এত কাল শুধু পুরুষের আশ্রয়ে থেকে মাধবীলতা সেজেছে; কিন্তু দুঃখের ডালি মাথায় বয়েও আভা আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠ, এইটাই তার পরম গৌরব।"

উমা তাহার দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—"কিন্তু তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পিছনে কি আছে, জান?"

"বল।"

"তোমার হারানো মনের গোপন ভালবাসা।"

প্রত্যুত্তর না দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উমাকে বক্ষে টানিয়া লইলাম! উমা কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। আদরের পরিচয় যখন তাহার রক্তিম ওষ্ঠাধরে অঙ্কিত হইল, তখন সে সবলে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—"যাও, তুমি ভয়ঙ্কর দুষ্ট হয়েছ।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি যাকে ভালবাসি, সে আভা নয়! হোক সে প্রভাতের রক্তগোলাপের আভা—আমি ভালবাসি তপস্বিনী উমা, এখনও যে তপস্যা ভোলেনি।"

উমা ফিরিতে ফিরিতে বলিল, "এ তোমার মিছে কথা। তপস্বিনীকে যে ভালবাসা দাও, তার পিছনে আছে অপরের পাওনা, তা আমি সত্য ক'রে জানি।"

তাহার চোখে-মুখে বিদ্যুৎ-ভরা হাসি। বাহিরে ভাদ্রের জলগুঞ্জন চলিতেছিল। মৌন বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে বসিলাম, উমার কথা সত্য? না ব্যঙ্গ? নিজের অন্তরে ঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। বাদল আকাশের মত মনটা ঘোলাটে হইয়া উঠিল।

অবচেতন মনের সমস্ত খবর কেহ জানে না, হয়ত কোনও দিন জানিবে না আর বোধ হয় না জানিলেই ভাল হইবে।
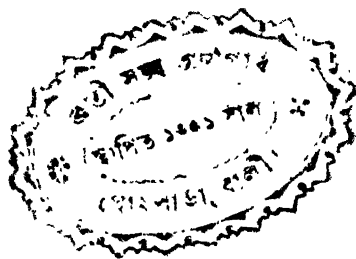
গবেষণা ও প্রেম

শারদ-প্রভাত। অতি-বর্ষণ শ্রাবণ বিদায় নিয়াছে—ভাদ্রের মেঘমুক্ত নীল আকাশে নূতনতর জ্যোতিঃ। সুধাংশু ওকালতি করে, কিন্তু ব্যবহার তাহার মন ভুলায় না—সে গবেষণা করে। প্রাচীন ভারতের বিগত দিনের ছবি তুলিতে তাহার আপ্রাণ যত্ন। শারদ-প্রভাতের মাধুর্য্য তাই তাহার চিত্তকে স্পর্শ করে না—সে ঋগ্বেদ খুলিয়া 'সভেয়' কাহাদের বলিত তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে মগ্ন ছিল। রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত সুধাংশুর চোখে অজ্ঞাতে ঘুম নামিয়া আসে—সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে।

কালের যাত্রা যেন পশ্চাদ্‌গতিতে বেদের যুগে ফিরিয়াছে। দর্ভ রাজার কাষ্ঠ-প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন। দর্ভপুত্র রথবীতি তখন রাজা। রাজার ইচ্ছা বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাই তিনি অত্রিকুলের মহাতপা অর্চ্চনানকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। চন্দ্রাতপের তলে সুন্দর বেদী—এক পাশে গার্হপত্য অগ্নি—এক পাশে আহবনীয় অগ্নি—নিম্নে দক্ষিণাগ্নি। শুষ্ক অশ্বত্থ কাষ্ঠে অরণি-সংযোগে অগ্নি সমুৎপাদিত হইল। তারপর উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে হোতা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—অন্য দিকে অধ্বর্য্য যজ্ঞ-কুণ্ডে হবিঃ প্রদান করিতেছেন। উদ্গাত্রী সামগান করিতেছেন—আর অর্চ্চনান প্রধান ঋত্বিক্‌রূপে সমস্ত দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ঋষির কণ্ঠে ঋক্ ধ্বনিত হইল—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্।
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত চ।
স দেবাঁ এহ বসতি। ইত্যাদি

সুধাংশুর মনে হইল সে যেন বর্ত্তমানের নয়—সে যেন যাজ্ঞিক ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্ব। বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে সে অগ্নির আহ্বান শুনিতেছে। সে যুগ এ যুগ নয়। হাতের কাছে সুইচ টিপিলে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে না, তাই অগ্নিকে কবির চক্ষে দেখা সম্ভব ছিল—শ্যাবাশ্বের অনুভূতি সুধাংশুর মনে জাগিল—অজ্ঞাতে সেও যেন গাহিল :

স্তুতি করি অগ্নি তোমা দেব বৈশ্বানর !
যজ্ঞ-পুরোহিত তুমি ঋত্বিক্ অমর। ইত্যাদি

কিন্তু অগ্নির শিখার বাহিরে কাহার ওই কাঞ্চন-বর্ণ দ্যুতি। সুধাংশু স্বপ্নে চোখ মুছিল—তাহার সুন্দর কেশদাম 'কপর্দ্দে' সজ্জিত—চোখে বিদ্যুৎ-দীপ্তি—ওষ্ঠে বিম্বরাগ—গলদেশে নিষ্কমালা।

কর্ণে দুলিতেছে কর্ণশোভনা—হস্তে খাদি—খাদি-প্রতিষ্ঠানের নহে—সেকালের মণিখচিত অঙ্গুরীয়ক—পরণে পশমী নীবি, তাহার উপর হিরণ্ময় দ্রাপী। শ্যাবাশ্বের চোখে লাগিল বিস্ময়।

সে বিস্ময় অনাদি ও শাশ্বত। নারীর যে ভুবন-মোহিনী রূপ যুগযুগান্তর নরের চিত্তে পুলক ও মোহ জাগাইয়াছে সেই রূপের অনুভূতি শ্যাবাশ্বের চোখে লাগিল। যৌবনেই এমন মুহূর্ত্ত জাগে—যখন আশার অরুণ রশ্মি জীবনের দীর্ঘ পথকে রহস্যময় ও মধুময় করিয়া তোলে। পিছনে পড়িয়া রহে কিশোর মনের চপলতা—সম্মুখে জাগে আনন্দের নন্দন-পারিজাত। আলোছায়ায় প্রতিটি কৌতুকেই সঞ্চরিত হয় নব নব আশা। পথের প্রতিটি মোড়ে জাগে নব নব প্রলোভন। মনে হয় বিশ্বমানবের চির-পরিচিত অভিজ্ঞতার পথ—তবু যেন তাহার মাঝে রহিয়াছে তাহার স্বতন্ত্র অনুভূতি—তাহার ব্যক্তি-সত্ত্বার বিশিষ্ট পুলক।

চারি চক্ষুর মিলন হইল। সুন্দরী সুবেশা রাজনন্দিনী রথবীতি-তনয়া সন্ধ্যা শ্যাবাশ্বের প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিল। শ্যাবাশ্ব মুগ্ধ হইয়া গেল।

সুধাংশুর অন্তরে যখন এমনই আনন্দস্ফূর্ত্তি তখন পত্নী এষা ডাকিল—কণ্ঠ মধুবর্ষী নহে, চোখে সন্ধ্যার বিদ্যুৎ চাহনি নাই—"শুনছ! ভোর বেলায় ঘুমিয়ে পড়ছ যে?"

সুধাংশু চোখ মেলিল। দূরে গেল বৈদিক যুগের সরল স্নিগ্ধ পরিবেশ—দূরে গেল প্রথম প্রণয়ের অপূর্ব্ব কুহক। সম্মুখে তাহার লেখার টেবিল অগোছাল হইয়া রহিয়াছে, বইগুলি ছড়ানো—এখানে এক টুক্‌রা কাগজ, ওখানে পেন্সিল, পাশে পত্নী এষা। দূরে পুত্র পড়িতেছে—টানা সুরে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

সুধাংশু প্রশ্ন করিল—কি?

ঝঙ্কার উঠিল—"এই সব বাজে কাজ না করে যদি খোকাকে পড়িয়ে দিতে তাহলে খুব ভাল হ'ত।"

—"বাজে কাজ?"

—"বাজে নয়ত কি? এই যে পঁচিশ বছর ধরে কাগজ কালি নষ্ট করছ—এর ফল কিছু ফলেছে?"

পত্নীর অনুযোগ মিথ্যা নয়। সুধাংশু সাহিত্যিক, বহু দিন সাধনা করিয়াছে—যদিও সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করিয়াছে তথাপি লক্ষ্মী বিরূপ। তাই নীরব হইয়া গেল।

—"কথা বলছ না যে? যদি নিজে না পড়াতে পার—একজন টিউটর রাখ—"

হায় অর্থহীন সে, সেখানেও তাহার মুস্কিল। সুধাংশু ডাকিল—"খোকা?"

—"বাবা!"

—"আয়, কি পারিস্‌নি বুঝিয়ে দেবো'খন—"

—"বাবা আমার পড়া হয়ে গেছে, এইবার ছুটি দাও, আমি ওদের বাড়ীর সুধার সঙ্গে লাটিম খেলব—"

—"আচ্ছা যাও।"

খোকার ত্বরা সহিল না, সে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। গৃহকর্ত্রী নিবারণ করিবার অবসর পাইলেন না।

এষা রাগিয়া বলিল, "নিজের মাথাটি খেয়েছ, এখন ওর পরকাল ঝর্‌ঝরে কর—"

সুধাংশুও হাসিয়া বলিল, "একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম—"

কৌতূহল নারীর স্বভাব-ধর্ম্ম। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভুলিয়া এষা বলিল, "কি?"

—"আমি দেখছিলাম যেন ভারতের সামগীতি ঝঙ্কৃত যুগে ফিরেছি—আমি যেন ঋষির তনয়—রাজার যজ্ঞে গিয়েছি, সেখানে রাজকুমারী সন্ধ্যা তার প্রেম দিয়ে আমায় মুগ্ধ করছেন—"

—"এই বুঝি তোমার গবেষণা—আমি ভাবি তুমি বুঝি বেদ, উপনিষদ পড়ছ—ওমা, তা না—তুমি পরস্ত্রীর চিন্তা করছ! এই তোমার ভালমানুষি, ডুবে ডুবে জল খাও।"

সুধাংশু হাসিল, বলিল—"পরস্ত্রী না হ'লে কাব্য হয় না, কিন্তু এটা আমার নয়, গল্পটা বেদের, শুনবে?"

এষা রাগিয়া বলিল, "কি এই এক কথা ছাড়া কি গল্প হয় না, তা হলে? তোমার বেদেও এই সব অনাসৃষ্টি কথা—"

সুধাংশু বলিল, "অনাসৃষ্টি নয়, সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা প্রেম। বেদে কি তার অভাব হতে পারে, শোন গল্পটি।"

—"মনে করেছিলাম আজ তিলের নাড়ু করব, তা হল না, তা হলে গল্পই বল শুনি।"

সুধাংশু উত্তর করিল, "অয়ি সুভাষিণি! তিল-লড্ডুকা ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি নেই, তুমি অবহিত হও।"

এষা হাসিয়া বলিল, "তুমি যে কথক ঠাকুরের মত আরম্ভ কর্‌ছ?"

—"কথক বই কি! দক্ষিণা চাই, দেবে ত?"

—"কি, চা আর আমলেট্?"

—"সে তর্ক এখন নয়, এখন গল্প শোন, তারপর দক্ষিণা বুঝে নেব।"

—"বল।"

সুধাংশু আরম্ভ করিল, "শ্যাবাশ্ব ঋষি-তনয়। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য যাপন করে' গৃহে ফিরেছেন স্নাতক হয়ে।"

এষা প্রশ্ন করিল, "স্নাতক কি?"

সুধাংশু বলিল, "আজকালকার ভাষায় বলতে পার—গ্র্যাজুয়েট হয়ে তখনকার দিনে যারা পাঠ শেষ করত, তারা সমাবর্ত্তন স্নান করে গৃহে ফিরত, তাই স্নাতক বলত। শ্যাবাশ্বের পিতা দার্ভরাজার পুরোহিত। রাজা যজ্ঞে পুরোহিতকে ডেকেছেন, পিতা পুত্রকে নিয়ে চললেন—সেখানে সন্ধ্যার সঙ্গে তার দেখা হ'ল আর জাগল ভালবাসা—"

এষা বলিল—"দেখা হল আর ভালবাসা হল এটা সম্ভব নয়, তোমাদের গল্পে উপন্যাসে চিরকাল এই মিথ্যা বলে চলেছ।"

সুধাংশু উত্তর দিল—"যুগে যুগে কালে কালে মানুষ যখন বলেছে, তখন হয়ত সত্য হবে।"

এষা কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়াছিল, বলিল—"তা হয় না, রোজ মানুষ দেখে সূর্য্য উঠছে পূব আকাশে, ডুবছে পশ্চিমে, তা কি সত্যি?"

সুধাংশু থামিয়া বলিল, "তুমি দেখছি বৈজ্ঞানিক হতে পারবে, কিন্তু এটা আমার গল্প, রস থাকলেই হ'ল, তত্ত্ব বিচার নিয়ে তর্ক এখন দরকার নেই—"

—"বেশ বল।"

—"শ্যাবাশ্বের পিতা রাগ করলেন না, তিনি দেখলেন, স্নেহময় পিতার চক্ষে পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক—রাজকন্যা সন্ধ্যা যোগ্য বধূ—রাজার নিকট কন্যা যাচ্ঞা করলেন—"

এবার প্রশ্ন—"কিন্তু ঋষি-তনয় ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা ক্ষত্রিয়কন্যা—তোমার গল্পটা স্বকপোলকল্পিত নয় ত?"

সুধাংশু বলিল, "না এটা সায়নাচার্য্য লিখেছেন তাঁর টীকায়। কিন্তু তোমার বেদের যুগে আর্য্যদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না—"

—"আচ্ছা রসভঙ্গের অপরাধ মার্জ্জনা করো—"

—"রাজা ভালমানুষ—পুরোহিত ঠাকুরকে না বলতে পারলেন না, কিন্তু শেষকালে মাথায় বুদ্ধি হ'ল—বললেন, একবার রাজমহিষীকে জিজ্ঞাসা করি।"

রাজমহিষী বুদ্ধিমতী, বলেন "রাজকন্যা নির্ধনের গৃহে কষ্ট পাবে—এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। রাজা কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দুঃখিত হ'লেন কিন্তু রাণীর কথা অবজ্ঞা করতে পারলেন না—"

—"তুমি যে আমায় খোঁটা দাও, দেখছ সেকালে রাজারা কেমন 'সিভাল্‌রি' (chivalry) জানতেন।

হাসিয়া সুধাংশু বলিল, "তা জানতেন, কিন্তু গল্পের নায়কদের নিয়ে নিজেদের জীবন তুলনা করতে যেও না—তাতে ফলম্ দুঃখম্।"

—"থাক্ দৈবজ্ঞ ঠাকুর, আপনাকে আর পঞ্জিকা আওড়াতে হবে না।"

—"শ্যাবাশ্ব সে কথা শুনে মুষড়ে গেল, চোখে দেখল কুজ্ঝটিকা—বুকে পেল অসহ বেদনা। মর্ম্মান্তিক দুঃখে সে চলল পথ বেয়ে দেশ-দেশান্তরে উদাসী পথিক।"

রাজা তরন্তের রাণী পথিককে দেখে মুগ্ধ হল, দুঃখদীর্ণ যুবকের চক্ষে জ্যোতির ছটা, মুখে প্রতিভার দীপ্তি। রাণী পথিককে ডাকালেন, বললেন "কি তোমার দুঃখ পরিব্রাজক?"

শ্যাবাশ্ব চমৎকৃত হ'ল, সংসারে দয়া ও সহমর্ম্মিতা নারীর কোমল অন্তঃকরণেই শোভা পায়—স্নেহের স্পর্শ তার চোখে জল নিয়ে এল, বলল, "ক্ষমা করুন দেবী! আমার ব্যথা—আমার গোপন কথা—"

রাণী তাকে প্রাসাদে নিলেন। পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হয়ে শ্যাবাশ্ব বলল, তার উজ্জ্বল প্রেমের কথা রাণী শুনলেন, হাসলেন আর কৌতুকভরে বললেন, "সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী?"

শ্যাবাশ্ব বলিল, "আমার চোখে দেবি।"

রাণী খুশী হলেন—রাজার নিকট নিয়ে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন—শ্যাবাশ্বকে ধনরত্ন, অশ্ব, গোধন ও মেষপাল দিলেন। রাণী বিদায় দিয়ে বললেন, "জয়ী হও ঋষিকুমার!"

ঋষিকুমারের চিত্তে তখন জাগল বাণী—শ্যাবাশ্ব রাণীর প্রশংসায় মন্ত্র রচনা করল—সে হল ঋক্।

'যারা দুঃখীর দুঃখে কাতর নয়, হৃদয় তাদের পাষাণ, তরুণী আনিন্দিতা রাণী শ্যাবশ্বকে অশ্ব দিয়েছেন—দু'টী রক্তবর্ণ দ্রুত গতি অশ্ব, তাই তার করুণার কথা স্মরণ করে আমার নাম হবে শ্যাবাশ্ব, নিষ্ঠুর-চিত্তা নারী জানে না মমতা—'

শ্যাবাশ্ব রাণীর ঘোড়ায় চড়িয়া পুরুমিহ্ন রাজার রাজ্যে চললেন।

এষা বলিল, "তোমার কথা শুনে মনে হয় শ্যাবাশ্ব তরন্ত রাজার রাণীকে ভালবেসেছিল—"

—"তার উত্তর দেওয়া কঠিন—ফ্রয়েডের কথা যদি সত্যি হয়—রাণীর মমতার পিছনে ছিল অতৃপ্ত কামনার দীর্ঘশ্বাস। ওটা দয়া নয়—ওটা কামনার ভোলফের কিন্তু সেকালের ঋষিরা ফ্রয়েড-তত্ত্ব জানতেন না, তাই তারা এমন ইঙ্গিত করেন নি।"

এষা জিজ্ঞাসা করিল—"ফ্রয়েডের কথা নয়, তুমি কি মনে কর—তোমার নিজের কথা বল।"

—"আমি ফ্রয়েডের কথা সত্য মনে করি না—মাতার চিত্তে যে প্রীতির মন্দাকিনী, ভগিনীর বক্ষে যে সোদর ভ্রাতৃবাৎসল্য তাকে আমি এত হীন মনে করি না। মমতা, প্রীতি, বাৎসল্য যেমন সত্য, দয়া, অনুকম্পা ও সহানুভূতি তেমনই সত্য—তাকে যৌন-লালসার অভিব্যক্তি বলা একান্ত ভুল হবে।"

খোকার খেলা শেষ হইয়াছিল। দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, 'মা সাপুড়ে যাচ্ছে—ডাক্‌বে ?"

রাস্তা দিয়া সাপুড়ে চলিয়াছে—তাহার বাঁশী বাজিতেছে। পুত্রের কৌতূহল দমনীয় নয়। সুধাংশু বলিল, "আচ্ছা যা ডেকে নিয়ে আয়।"

এষা বলিল, "না না থাক্, সাপ দেখতে আমার বড় ভয় করে।"

খোকা বলিল, "না ভয় কি, আমি আমার বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার ভয় নেই।"

এষার ভয় দূর হইল কি না জানি না—হাসিতে হাসিতে বলিল "তবে যা—"

সুধাংশু বলিল,

"প্রেমের পাঁচালি এই মধুমাখা জানি

সুধাংশু বাখানে আর শুনে এষারাণী—"

এষা—"আজ সন্ধ্যাবেলায় শুনব।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। খোলা ছাদে শুইয়া সুধাংশু রজনীগন্ধার গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছিল আর আকাশে নক্ষত্রের যাত্রা দেখিতেছিল। বৃহস্পতি গ্রহের দীপ্ত আভা তাহাকে মুগ্ধ করিতেছিল। খোকা ঘুমাইয়াছে।

এষা আসিয়া—বলিল, "এখন বল।"

সুধাংশু বলিল, "শ্যাবাশ্বের কথা মনে পড়ায় আমার দুঃখ হচ্ছে—ও প্রেমকে জয় করেছিল, কিন্তু আমরা ?"

এষা হাসিয়া বলিল, "থাক্, এখন রসিকতার প্রয়োজন নেই—"

—"রসিকতা নয়, সেদিন একটা বই পড়েছি—লেখক বলেছেন ভারতবর্ষের বিয়ে প্রেমহীন—"

—"থাক এই আমাদের ভাল।"

—"কিন্তু মনে কর তোমার আমার বিয়ের কথা—বিয়ের আগে তোমায় দেখিনি—কাকা এসে বললেন, তুমি নেহাৎ কালিন্দী—বাবা ও মামার উপর ভয়ানক রাগ হ'ল, অবশ্য ভার না হয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তাই বলে একথাটি তাদের জানা উচিত ছিল—"

এষা রাগিল, "আর দুঃখ রেখে লাভ কি—এইবার একটা বিয়ে পাশ—কটা মেয়ে বিয়ে করে মনের ক্ষোভ মেটাও—"

সুধাংশু বলিল, "কথাটি তুমি ভুল বুঝছ, আমি বলছি প্রেমকে যখন সহজে পাওয়া যায়, তখন তাকে ঠিক পাওয়া যায় না—তাই তাকে জয় করে নিতে হয়।"

এষা খানিক শান্ত হইল—"কিন্তু আমাদের ত দিন চলছে—অসুবিধে কিছু হচ্ছে কি?"

—"সে আলোচনা নিষ্ফল, আর করাও বিপজ্জনক।"

—"বেশ বুঝতে পারছি, তাহলে তুমি ভালবাস না?"

—"আসল কথা যদি চাও, তা হলে বাসি না—কারণ ভালবাসার জন্য ত বিয়ে হয়নি, তুমি এসেছ গৃহিণী হয়ে।"

—"বেশ বেশ, তা হলে এসব প্রেমের গল্প পড়াই বা কেন আর বলাই বা কেন?"

—"হয়ত মনের দুঃখ মেটানো।"

—"তুমি বক্তৃতা করবে, না গল্প বলবে?"

—"গল্পই বলছি।"

পাশের বাড়ীর মেয়েটি পড়ে—তাহার একঘেয়ে টানা সুর বাতাসে ভাসে, ওপাশের বাড়ীতে রেডিও বাজে, রাস্তায় মোটরের হর্ণ বাজে। সুধাংশুর মনে হয় এই পরিবেশ শ্যাবাশ্বের গল্পের নয় কিন্তু অভাগিনী এষাকে সে দুঃখের কথা বলা চলে না।

সুধাংশু আরম্ভ করে—"অশ্ব চলে, বায়ুর মত তার গতি—রাণী দিয়েছেন যুগ্ম অশ্ব একবার চড়ে একটায় আবার অন্যটায় এমনই করে যাত্রা চলে —নদনদী গিরিকান্তার ছাড়িয়ে চলেছে উৎসুক বর—মনে পড়ে বধূর মুখ, যজ্ঞধূমের মেঘে আচ্ছন্ন সেই শরদিন্দু নিভাননার কথা। সেই অনুপম মুখচ্ছবি জাগায় উৎসাহ—দেয় আনন্দ।

এষা বলে—"তুমি আমায় সত্যি কুরূপা মনে কর?"

—"কেন?"

—"মনে হচ্ছে তুমি কল্পনায় দেখছ জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীর রূপ—"

—"এ তোমার অন্যায় এষা! তুমি কি কল্পনাকেও শাসন করতে চাও?"

—"চাই বই কি! যে মন্ত্র পড়েছ তাকে মন-প্রাণ-জীবন-যৌবন সবই ত দেবে, এমনই ত চুক্তি—"

সুধাংশু হাসে—রেডিওর গান থামে। তাহার সুরঝঙ্কার ভাসিয়া আসে—পাশের বাড়ীর কলেজ-পড়ুয়ার গলাটি শোনা যায়। সে বলে—"তা হলে ভাব—এ মানসী তুমিই—"

এষা স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসে, প্রশ্ন করে "সত্যি?"

সুধাংশু পত্নীর এলায়িত কুন্তলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলে—"সত্যি।"

ক্ষণিক বিভ্রম। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই ত অনন্ত কালের সম্ভাবনা। এষা সুন্দরী গৌরী নয়, সে ভাবে স্বামী তাহাকে পাইয়া খুসী হয় নাই, সেই বেদনা কাঁটার খোঁচার মত তাহার বুকে বেদনা জাগায়।

এষা বেদনা ভুলিয়া যায়। স্বামীর আদরে সে গলিয়া যায়। বিশ্বে কলকোলাহল আছে—থাকুক, সংঘর্ষ আছে—থাকুক। যুদ্ধ, হিংসা ও বিপ্লব সত্য—কিন্তু এই নিভৃত সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার গন্ধসুরভি ছাদে এই যে ক্ষণিকের বিভ্রম—মানুষের ইতিহাসে তাহার হয়ত কোনই মূল্য নাই, কিন্তু এই দম্পতীর জীবনে তাহা চিরন্তন হইয়া বিলাস করে।

খানিক পরে সুধাংশু বলে—"শ্যাবাশ্ব পুরুমিহ্ন রাজার রাজ্যে পৌঁছে গেলেন।"

এষা বলে,—"তারপর?"

—"বিদদাশ্ব রাজার ছেলে পুরুমিহ্ন খুব জ্ঞানী ছিলেন।"

এষা বাধা দিয়া বলিল,—"নামগুলি খুব বিদঘুঁটে।"

—"কালে রুচির তফাৎ হয়—রাজা শ্যাবাশ্বকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে বন্দনা

করলেন—বললেন, 'বলুন ঋষি আপনার আদেশ।' তখনকার দিনে মানুষ সরল ছিল, মিথ্যা গরিমা নিয়ে দম্ভ করতে তারা লজ্জিত হত। শ্যাবাশ্ব বলল, 'আমি ঋষি নই, আমি শাস্ত্র পড়েছি, আমার সত্য দৃষ্টি হয়নি।' রাজা খুসী হয়ে বললেন 'আপনি সত্যবাক্, সত্য আপনার নিকট প্রকাশ হবেন—বলুন আপনার প্রার্থনা।' শ্যাবাশ্ব বললেন, 'আমি কামাতুর, রাজতনয়া সন্ধ্যার পাণিপীড়নে আমার অভিলাষ, কিন্তু আমার অর্থ নেই।' রাজা তখন তাকে স্বর্ণ, মণি ও শত গাভী দান করলেন। শ্যাবাশ্ব আহ্লাদে আটখানা হয়ে গৃহের দিকে রওনা হলেন।"

এবা প্রশ্ন করে—"রাজারা সেকালে খুব দানশীল ছিলেন?"

—"তা ছিলেন—দানস্তুতি বলে বেদে অনেক সূক্ত আছে, সেকাল আর একাল নয়, মানুষের মহত্ব তার দানের মধ্যেই বোঝা যায়।"

—"আচ্ছা ও-কথা থাক্, গল্প শেষ কর, রাত অনেক হ'ল—"

—"হোক না—মনে কর তুমি আমার সেই মানসী সন্ধ্যা, আমার হৃদয়-বধূ, তোমাকে জয় কররার জন্য চলেছি শ্যাবাশ্বের মত—"

—"হয়েছে বাপু, তাই না হয় মনে করলাম, আরম্ভ কর তোমার স্তুতি—"

—"অয়ি বরদে দেবী! তুমি প্রসন্ন হয়েছ, তাই ত আমার কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ—গদ্‌গদ হয়ে—"

এবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

হাসি থামিলে গল্প চলে—"শ্যাবাশ্ব খুশী মনে ফিরছে, তখন পথে এল মরুৎগণ, শ্যাবাশ্বের চিত্তে অজানিতে ভাষা ফুটে উঠল, শ্যাবাশ্ব গেয়ে উঠল স্তোত্র—মরুৎগণ ঝড়ের দেবতা ইন্দ্রের চিরসাথী রণদুর্ম্মদ বীর্য্যবান্ মূর্ত্তি, রুদ্র তাদের পিতা, পৃথ্বী তাদের মাতা—তাদের সোণালী ওড়না ওড়ে—শোণিত-স্রোতের মত—শ্যাবাশ্ব গেয়ে ওঠে—

এষা বলে, "তোমার সংস্কৃত মন্ত্র আমি বুঝতে পারব না।"

"বোঝাটাই সব নয় এষা, শোন না—মানুষের আদিম কণ্ঠের প্রথমতম ভাষা—এর মাঝে আছে জীবনের চঞ্চল শিহরণ—প্রথম আবেগের অস্ফুট কাকলী—অপূর্ব্ব অনবদ্য মন্ত্র।"

—"তুমি যে বাগ্মী হয়ে উঠছ!"

—"ওটা আমার স্বভাব—তবে বেদ-মন্ত্রকে শ্রদ্ধা করেই বলতে হয়, ভাব দেখি কোন দূর অতীতে সরস্বতীর তীরে এই সমস্ত মন্ত্র রচিত হয়েছিল, তারপর কতকাল গেছে তবু তার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র রয়ে গেছে—এগুলি আমাদের পিতৃপিতামহের ধন—রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য্য গেছে, দুঃখ এসেছে, দৈন্য এসেছে তবু ভুলিনি—এদের মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে রেখেছি—শোনো এষা!"

এষা বলিল, "তুমি না হয় বাংলা করে বল—আমি অভক্তি করছিনে, কিন্তু না বুঝে আবৃত্তি শোনার আনন্দকে বরদাস্ত করতে পারব না।"

সুধাংশু বলিল, "আমি ত কবি নই, ঋষি নই—তবে তোমার জন্য মুখে অনুবাদ করছি, তাতে মূলের গম্ভীর উদাত্ত সুর হারিয়ে যাবে।"

—"যা পাব তাতেই খুসী হবো।"

সুধাংশু বলিয়া চলিল—

কোন সুদূরের বুক থেকে আজ
তোমরা এলে বীরের দল,
সবার সেরা বীর্য্যে অবিচল,
কেমন করে একলা এলে
কোথায় গেল তুরগশ্রেণী?

রোদসী যে ডাকছে গেহে দুলিয়ে দোদুল বেণী—
যাও না ঘরে আগুন তাপে
জুড়িয়ে নেবে দেহ
বধূর পাবে স্নেহ।

এষা বলিল, "শুনতে ত মন্দ নয়।"

সুধাংশু বলিল, "এটা আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তোমার জন্য তাড়াতাড়ি ভাবার্থ বলছি—তারপর শ্যাবাশ্ব—তরন্তের সুন্দরী রাজ্ঞী শাশিয়াসির জন্য বর প্রার্থনা করল—রাণী যাতে ধনে ঐশ্বর্য্যে গৌরবময়ী হয় তা জানাল।"

মরুদ্‌গণ খুসী হলেন। বললেন, "আজ থেকে তুমি ঋষি।"

শ্যাবাশ্ব নূতন দৃষ্টি পেল। তিমির-যবনিকা যেন যাদুমন্ত্রে দূরে চলে গেল। সত্যের যে পবিত্র রূপ তা তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হল। সেই উদ্বোধন কি আনন্দের, সেই জাগরণ কি আবেগময়, কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হল নব নব মন্ত্র।"

এষা জিজ্ঞাসা করিল—"একি সম্ভব?"

"সম্ভব, শেখা ত গেলা নয়—হৃদয়ে সত্যজ্যোতিঃ জ্বলছে, তার অনির্ব্বাণ ভাতি আমরা দেখতে পাই না—কারণ আমাদের দৃষ্টি আড়ষ্ট, ব্যাহত, তমোময়—যেদিন আঁধার ঘোচে, সেদিন জাগে বোধি, আমাদের তপস্যার—আমাদের সাধনার এই ত মন্ত্র।"

এষা স্বামীর ভাবোচ্ছ্বাস দমন করিবার জন্য বলিল, "তারপর?"

শ্যাবাশ্বের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে আছে—আর একদিন তোমায় আসল মন্ত্রগুলি পড়ে শোনাব—মন্ত্র যখন শেষ হয়ে এল তখন রাত্রি-দেবতাকে আহ্বান করে শ্যাবাশ্ব বলল—'হে ঊর্ম্যা! তুমি দার্ভ্যের নিকট আমার

এই স্তুতি বহন করে নিয়ে যাও—নিয়ে যাও তোমার দ্রুতগতি রথ্যায়—রথবীথিকে বল, যখন যজ্ঞ শেষে রাজা সোম পান করবেন তখন বল যে আমি আমার প্রার্থনা পুনরায় জানাব। রাজতনয়া সন্ধ্যার পাণি-প্রার্থনা করি, যাও দেবী, রথবীতি দূর পাহাড়ের কোলে বাস করে, তার রাজ্য গোধনে সমৃদ্ধ, যাও সেখানে তুমি আতিথ্য পাবে।'

—"রাত্রিদেবী শ্যাবাশ্বের প্রার্থনা শুনলেন।"

"তারপর?"

"রথবীতি যজ্ঞ শেষে উৎসব করছেন—সোমপাত্রের উজ্জ্বল আনন্দে রাজ-অঙ্গন উল্লসিত। রাত্রিদেবী এসে বললেন, 'আমি শ্যাবাশ্ব ঋষির দূত—ঋষি তাঁর প্রথম প্রণয় ভোলেননি,—সন্ধ্যা ছিল সেখানে—তার লাবণ্যময়ী মুখে জ্বলল অলৌকিক লাবণ্য, আর্ব্বনান উৎসুক হয়ে চাইলেন। রাত্রিদেবী বললেন, 'মরুৎগণ প্রসন্ন হয়ে বর দিয়ে গেলেন—শ্যাবাশ্বের মন্ত্রে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন।' রথবীতি মহিষীর দিকে চাইলেন। রাণী রাত্রিদেবীকে বললেন,—"ঋষির কণ্ঠে আমার কন্যা মালা দেবে—চারিদিকে সাধুবাদ উঠল।"

—"তারপর?"

—"আমার কথাটি ফুরালো—নটে গাছটি মুড়ালো—রথবীতি শ্যাবাশ্বকে অভিনন্দন করার জন্য সভাসদ্ পাঠালেন পরম সমারোহে বিতাড়িত শ্যাবাশ্ব ফিরে এল—তারপর শুভলগ্নে শুভযোগে—সন্ধ্যা ও শ্যাবাশ্বের বিয়ে হ'ল।"

—"সেকালের বিয়ের রীতিটা বর্ণনা কর না।"

শুধাংশু বলিল, "তার মধ্যে গল্পের রস নাই—আর সেইটাই ত গৌরবের কথা। শ্রৌতসূত্রে বিয়ের যে প্রণালী পড়ি—আজও আমাদের দেশে প্রায়

সেই ভাবেই বিয়ে হয়—বরের পিতা সঙ্কল্প শেষে বরকে বলতেন—ধর্ম্মার্থ কামেষু নাতিচরিতব্যা। বর উত্তর দিতেন—নাতিচরামি। পত্নীর আসন ছিল উচ্চ—সম্মানের ও গৌরবের—সেকথা পড়লে মন খুসী হয়ে ওঠে। তারপর কঙ্কণ-বন্ধন, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদী গমন ও লাজ-হোম হ'ত। সে সব নীরস—শিলারোহণ করে বধূ ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বলতেন—ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহম্ ভূয়াসম্—বধূ যেতেন স্বামীগৃহে অগ্নিহোত্র জ্বালতেন আর অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সুধাভাষিণী সুহাসিনী হয়ে থাকতেন।"

—"তুমি কি বলতে চাও, আমি সুধাভাষিণী নই।"

—"না আমি কিছুই বলতে চাইনে—তুমি যা তুমি তাই—অনন্যা, অপূর্ব্বা।"

এষা রাগিয়া উঠিল, বলিল, "জানি মশায়, তুমি মনে মনে আমায় কিছুতেই ভালবাস না—শ্যাবাশ্ব যেমন জয় করেছিল—তুমি কি···"

সুধাংশু হাসিয়া পত্নীকে বক্ষে আদর করিয়া টানিয়া লইল—"অতীতের ভুল এখন না হয় শোধ করি—"

"বা, এই বুঝি তোমার গবেষণা!"

সুধাংশু খানিক কথা কহিল না। রাত্রিচর একটা পাখী অকারণে ডাকিয়া গেল—আকাশে রাশিচক্র সরিয়া গিয়াছে।

—"কথা বলছ না যে?"

সুধাংশু বলিল, "গবেষণা বড় নয়, প্রেম বড়।"

এষা কথা বলিল না—বলিষ্ঠ স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে তৃপ্ত নীরব হইয়া রহিল।

দূরে ধ্রুব নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। আকাশে মেঘেরা খেলিতেছিল—তাহারা সরিয়া গিয়া ধ্রুবকে মুক্ত করিল। ধ্রুব নক্ষত্র যেন সকৌতুক নেত্রে দম্পতীর

প্রতি চাহিয়া লইল—হয়ত মনে মনে বলিল, "গবেষণাও বড় নয়, প্রেমও বড় নয়—যা ধ্রুব, যা শাশ্বত তা আমার মতই শান্ত, সমাহিত ও আবেগহীন।"

খোকা কাঁদিয়া উঠিল। এষা উঠিয়া বলিল, "যাক্ এই প্রেমের গল্পের জন্য বেদ পড়ার কি দরকার?"

সুধাংশু নিরুত্তর রহিল। নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে কান্না-মুখর হইয়া ওঠে—সে তখন বলে—"থামাটাই মিথ্যা—যা চলছে তাই সত্য।"

পাশের বাড়ীর ইউক্যালিপটাস গাছে যে পাখীটি ঘুমাইতেছিল—সে ডাকিয়া উঠিল। সে যেন বলিতে চাহিল—"তা ঠিক—যুগযুগান্তর একই রহস্য—চলার পথেই তার নিত্য নূতন রূপ।"

ছোট ও বড়

—এক—

শৈশবের ইতিহাস কুয়াসার মত মনের কোণে অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া দেয়! অনেক কথা ভুলিয়াছি। দুই চারি কথা কিন্তু জ্বলন্ত হইয়া চোখে ভাসিয়া বেড়ায়।

তখন স্কুলে পড়ি। সদ্য জাগ্রত কবিপ্রতিভার উচ্ছ্বাস লইয়া রঙীন স্বপ্ন আঁকিতাম। জগতের সহিত সত্য পরিচয় নাই—কাব্যের বাতায়নের মাঝ দিয়া জগৎ দেখিতাম।

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া শুনিলাম—পাড়ার নফর মণ্ডল কাকুতি

বাবা বলিতেছেন—"না নফর, এখনকার দিনকাল ভাল নয়, বিশ্বাস রাখা দায়, তুই একটা দলিল লিখে দে।"

নফরের বল-দৃপ্ত মুখে অপ্রসন্ন বিষাদের কালিমা ছাইয়া গেল। সে বলিল "বাবু, বুড়ো কর্ত্তা চিরকাল বিশ্বাস করেছেন সে বিশ্বাস ভাঙ্গবো—এত বড় নিমকহারাম নই।"

ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছিল—সকল কথা শুনিবার ধৈর্য্য ছিল না।

নফরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সেই সত্যনিষ্ঠ সাহসোজ্জ্বল ভঙ্গিমা আমার মর্ম্মতলে গভীর ছাপ দিয়াছিল।

নফরের বাড়ী ছিল নদীর তীরে—ভৈরবের কূলে আম গাছে ছাওয়া ছোট কুঁড়ে। জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে আমের জারক করিবার জন্য ছুরি, নুণ এবং লঙ্কা লইয়া বন্ধুবান্ধবে জটলা করিতেছিলাম।

নফর আসিয়া বলিল—"কি করছ, দাদাবাবু? আম পাড়ছ? যত খুসী খেয়ে নাও আজ, আমি জমী বিক্রী ক'রে দিয়েছি—আর খেতে পাবে না।"

"কেন বিক্রী করলে?"

সজল কাতর চোখে সে বলিল—"দেনার দায়ে, বাবু!" তাহার চোখের কোণে জলের ফোঁটা জমা হইয়া গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"কোথায় যাবে তুমি?"

"ঐ দেখেছ বাবু চর, ঐখানে কুঁড়ে বেঁধে থাকব?"

"কেন, দেনা না হয় পরে শোধ দিও।"

"তা হয় না বাবু, টাকাটা অনেক দিন নিয়েছি। ধর্ম্ম রক্ষা হবে না!"

আমি অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নফর চলিয়া গেল—সে আম-বাগানে আর জটলা হয় না। পরে শুনিলাম, নফর আমাদের দেনা শোধ করিবার জন্য তাহার ভিটাবাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল।

ঠাকুর দাদার নিকট হইতে সে মৌখিক টাকা লইয়াছিল—সাক্ষী ছিল না—দলিল ছিল না—আদালতে নালিশ টিকিত না। কিন্তু তবু সে দিল—কারণ, ধর্ম্মরক্ষা হয় না।

নফরের কথা অনেক দিন ভাবিয়াছি। স্মৃতি সেই ভৈরবতীর, সেই আম্রকানন, সেই নফর ও তাহার কথোপকথন ছায়াচিত্রের ছবির মত মনে আনিয়া দেয়।

নফর মানুষের মত মানুষ—চরিত্র তাহার অতুলনীয়, তাহার মানুষের ধর্ম্ম সে বজায় রাখে; তবু সে হেয়, সে অপাংক্তেয়। সে চাষা—ভদ্র-সমাজে তাহার স্থান নাই।

কিন্তু সংশয় তর্ক তোলে, সত্যই কি সে ছোট?

—দুই—

বড় হইয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতেছি।

কল্পনা ছিল কত। কবি রবির মত কাব্যের লীলা-নিকেতন রচনা করিব, আর দক্ষিণ-পবনের উতল মাদকতায় দিনের পর দিন বসন্তের অভি-নন্দন করিব—সে বসন্ত ঋতুর আয়তনে আবদ্ধ নহে—সে বসন্ত যৌবনের কল্পনায় মধুর, ভাবের আতিশয্যে অসীম।

কবিত্ব ও জীবনে আসমান জমীন তফাৎ। কাব্য মিলাইয়া যায়, ধূলির স্পর্শ সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে নির্ব্বাপিত করে।

বাবা বলিলেন, "আমার ছাত্র হরেন এখন বড় চাকুরে—সাহেব-সুবোর সঙ্গে তার খুব আলাপ! যা তার কাছে, গেলে একটা সুরাহা হবে।"

কি করি? পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে হয়। বড়লোকের দরজাকে ভয় করি—তাহাদের পদলেহন করিবার বিদ্যা অর্জ্জন করি নাই।

তবু চলিলাম।

বালিগঞ্জে হরেন বাবুর বাড়ী।

মার্ব্বেল পাথরে গড়া প্রাসাদ—আসবাবে ভরা! পুষ্পলতায় সমৃদ্ধ কাননে ইতালী ও গ্রীসের ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে। ভয়ে ভয়ে ঢুকিলাম। বাবার চিঠি ও নিজের নাম পাঠাইয়া দিলাম। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—"বাবুর অসুখ। সময় হবে না—।" পুনরায় কাকুতি করিয়া বলিলাম—"দুমিনিটের জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি, অনেক দূর হতে অনেক আশা নিয়ে এসেছি।" উত্তর আসিল না। বেয়ারা বলিল, "যান বাবু, আজ আর দেখা হবে না।"

এমন সময়ে রোলস রয়েস কার আসিল। আরোহী নামিয়া ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওহে হরেন, চল একবার শিবপুরে। পিকনিক আছে।"

পীড়িত হরেন বাবুর নামিতে ক্ষণবিলম্ব হইল না।

"আরে ভবেশ! ভাল আছ?"

আমাকে দেখিয়া বেয়ারাকে বলিলেন, "কে ছোকরা ওখানে!"

সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, "আমি উপাধ্যায় মশায়ের ছেলে।"

কথা বলিয়া মিনতি জানাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। হরেন বাবু অকস্মাৎ রুক্ষ হইয়া বলিলেন, "ভদ্রতা জান না দেখছি। এখন এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করছি, এখন বিরক্ত করতে আছে?"

পিছাইয়া গেলাম। বাবুরা অগ্রসর হইলেন—তাঁহাদের আলাপের মধ্য দিয়া কাণে আসিল—"পাড়াগেঁয়ে ভূত।"

চোখে জল আসিল। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সন্তান শ্ববৃত্তির উমেদারী করিতে আসিয়া যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিলাম।

মিথ্যা যাহাদের কাছে মিথ্যা নহে, তাহারাই সংসারে ভদ্র? সন্দেহ করিতে ভয় হয়! হরেন বাবু বাঙ্গালা দেশের নেতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য—বিদ্যোৎসাহিনী সভার পাণ্ডা—ধর্ম্মরক্ষিণীর সম্পাদক, দেশপূজ্য নেতা। কিন্তু কাব্য-পড়া পণ্ডিতের ছেলে আমি। নফরের চরিত্রও চরিত্র আর হরেন বাবুর চরিত্রও চরিত্র—নফর ছোট, হরেন বাবু বড়।
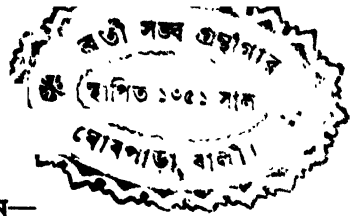
—তিন—

উমেদারী না করিয়াও চাকুরী মিলিল। বি, সি, এস পরীক্ষা পাশ করিয়া ডেপুটীগিরী চাকুরী। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চাকুরী লইয়াছি।

প্রোবেশনারি করি।

ফৌজদারী মামলা চলে—আমি বসিয়া শিক্ষানবিশি করি।

মামলার ঘটনাটি কৌতুক-জনক—আক চুরি। ক্ষেতের মাঝে যখন ফরিয়াদি কাজ করিতেছিল, তখনই আসামী ভিখু আক চুরি করিয়া পলাইতেছিল, হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে! দুই পয়সা দামের আক—কিন্তু তবু পুলিস কেস চালান দিয়াছে। ৩০।৪০ জন সাক্ষী হাজিরা দিয়াছে।

ভিখু বলিল, "হুজুর মা বাবা, আমি আক চুরি করিনি। মামলা একদম মিছে।"

কথা শুনিয়াই কলম তুলিয়া ভিখুর দিকে চাহিলাম। সে মুখ প্রশান্ত—সত্যের জ্যোতিতে দীপ্ত।

"হুজুর! গাঁয়ের চাটুয্যে বাবুই এই মামলার পিছনে আছেন—আমার বাড়ীর পাশেই কালু ডোমের বাড়ী—কালু ডোমের পরিবার দেখতে পিরতিমের মত—উনি তাকে বেইজ্জত করতে গেছলো। কালু বাড়ী ছিল না—আমি ওকে সন্ধ্যাবেলা দুঘা দিয়ে দেই। সেই রাগে উনি এই মিথ্যা নালিশ এনেছেন।"

কিন্তু সাফাই সাক্ষী মিলিল না; অথচ পুলিস ৩০।৪০ জন বাছাই ভদ্রলোক আনিয়াছিল সাক্ষী। দাদা বিচার করিয়া ভিখুর এক মাস জেলের ব্যবস্থা করিলেন। আমার মনে অসহায়া নারীর ছবি বারে বারে জাগিয়া

উঠিল। খাসকামরায় দাদাকে বলিলাম—"ভিখুর কথা সত্য ব'লে মনে হয়।" দাদা হাসিলেন, বলিলেন,—"ভায়া, কাব্য নিয়ে বিচার চলে না। আমরা দেখে দেখে ঘাগী হয়ে গেছি, আমরা সব ঠিক বুঝি।"

কিন্তু দাদার ঠিক বোঝা বেঠিক হইল। মাস পাঁচ ছয় পরে চাটুয্যে কালু ডোমের নামে জখমের মামলা আনিল। আমার কাছে বিচার চলিল—সাক্ষী ও প্রমাণ লইয়া বুঝিলাম, ভিখুর কথাই সত্য। কালুকে খালাস দিয়া মিথ্যা মামলা আনার জন্য চাটুয্যেকে জেল দিলাম। কিন্তু মিথ্যা মামলায় ভিখু জেল খাটিয়া মরিল।

মরুক—তবু সে বীর—অসহায়ের আশ্রয়। সমাজে সে ঘৃণিত নিন্দিত; কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে মহামহিম যখনই তাহার কথা মনে পড়ে, তাহাকে শ্রদ্ধার অভিনন্দন জানাই।

—চার—

উত্তর-বঙ্গে বন্যার প্লাবনে হাহাকার উঠিল।

মানুষের দৈন্য ও বেদনার কথায় অন্তর ব্যথিত হয়। দেশে সহানুভূতির সাড়া জাগিল—আমি যে সহরে থাকি, সেখানেও সাহায্য-সমিতি গঠিত হইল —কর্তা হইলেন সহরের এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি। নাম ও পদ নাই বলিলাম।

পতাকায় ভিক্ষার আবেদন জানাইয়া স্বেচ্ছাসেবকেরা ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিল।

চারিদিক হইতে অযাচিত সাহায্য আসিল। আমি তখন সে সহরে এস, ডি, ও।

তাঁহার কাজের প্রশংসা করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট দিলাম—নববর্ষের দিনে রায়-বাহাদুর খেতাব জন্মিল।

বৎসরান্তে টাকার হিসাব চাহিলাম—রায়-বাহাদুর বলিলেন—কাজ শেষ হইলে দিবেন। কাজ শেষ হইতে বছর দুই তিন লাগিল। হিসাব চাহিলাম, তবু হিসাব পাইলাম না। রায়-বাহাদুর বলিলেন—হিসাব হারাইয়াছে।

কাণে নানা গুজব আসিল—কেহ বলিল, রায়-বাহাদুরের বালিগঞ্জের বাড়ীর টাকাটা সাহায্যসমিতির ভাণ্ডার হইতে আত্মসাৎ করা। কিন্তু উপায় নাই। নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল।

রায়-বাহাদুরকে ধমক দিলাম—ফল হইল না। আত্মকৃত কার্য্যের জন্য নিজেই পস্তাইলাম।

ভিখুর সহিত তুলনা আসিয়া পড়ে—সে পরকে সাহায্য করিয়া খাটিল জেল—লাভ করিল অপমান অত্যাচার। কারণ, সে ছোট।

রায়-বাহাদুর বড়—তাই তাঁহার পরস্বাপহরণ তাঁহাকে আনিয়া দিল গৌরব-টীকা। ভিখুর বীরত্ব কেহ জানিবে না—কেহ বুঝিবে না; কিন্তু রায়-বাহাদুরের জীবন-চরিত লেখা হইবে—বহু বর্ষের পর বহু বর্ষ ধরিয়া এই তস্কর মহাপুরুষের কীর্ত্তি জাতির আদর্শ হইয়া রহিবে—ভিখু ছোট, রায়-বাহাদুর বড়।
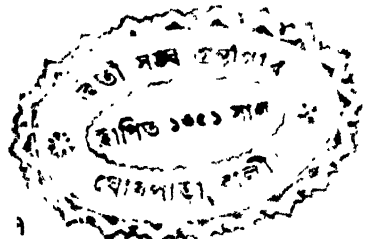
—পাঁচ—

কথাগুলি তিক্ত হইলেও সত্য। কিন্তু সত্যের যুগ আর নাই। মিথ্যার জয়ধ্বজা এখন চারিদিকে বাজিতেছে।

লোকে আমাকে বিশ্বনিন্দুক বলে। বলুক, উপায় নাই। কাহারও সঙ্গে মিশি না—মিশিতে পারি না—অভিজ্ঞতায় যাহাদিগকে চোর-জুয়াচোর বলিয়া জানি—তাহারাই মানী, তাহারাই গুণী। কিন্তু এই সব বড়র সঙ্গে আমার ভাল লাগে না—আমি এক কোণে পড়িয়া থাকি।

এখানে ফুল ফোটে—আকাশে তারা হাসে—আর আমারই মত যাহারা ভাবের দোলার পথিক ছিল, তাহাদেরই বই থরে থরে সাজানো আছে।

লোকে বলে 'কুণো'! বলুক, আমি আপন মনে নিভৃত দিন যাপন করি—কাহারও কথায় চঞ্চল হই না।
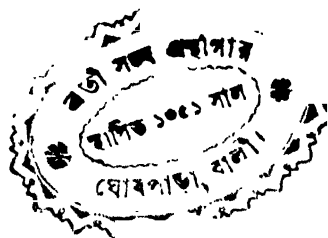
খুকু

—এক—

দেড় বছরের খুকু ফুলের পাপড়ির মত কোমল তাই নাম পাপড়ি। সে যেন ঠিক ফুলেরই কুঁড়ি—মৃত্তিকার জীবন-রস থেকে সে আপনার প্রাণের খোরাক যোগাড় করে। ধুলাবালির সাথে তাই ওর যেন নাড়ীর যোগ।

ওর মা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, বলে 'আর পারি না, রাতদিন কাদা মাথবে।' আমি কথা কহি না, অন্তরে অন্তরে হাসি। ধরার ধূলির যে আহ্বান প্রতিনিয়ত অন্তরে আবেদন জাগায়, সে কথা কবিত্ব—সে বাজে, সে তুচ্ছ। চাল, ডাল, তেল, নুন কিংবা শাড়ী গহনার মত তার অস্তিত্ব স্পষ্ট নয়, তাই তাকে না মানিলে অপরাধ নেই।

আমার হাসি কিন্তু অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়, মানিনী ভ্রূভঙ্গ করে বলেন "তুমি আদর দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছ।" নিরুত্তর মৌনতা জীবন চলার পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয় সম্পৎ, তাই নিরুত্তর রহি।

ভালবাসি, তা সত্য। ওর প্রাণে স্ফুটনোন্মুখ যে সাড়া তা আমার মন ভুলায়। অস্ফুট কাকলীর মত ওর কথাগুলি তাই বড় মিষ্ট লাগে।

কর্ম্মক্লান্ত দিনে যখন গৃহে ফিরি, এগিয়ে দাঁড়িয়ে বলে 'বাবা বাবা······।'

অমিয়-বচন কথা কাব্যে পড়েছি—কিন্তু জীবন্ত শুনি পাপড়ির মুখে। সুধামাখা ডাক বিহ্বল করে, বলি 'মা···।' ঝাপিয়ে এসে কোলে চড়ে।

খেতে বসলে পাশে বসে, বলে 'বাবা! ডাই খাই।' তুরতুরে ফুরফুরে এই দেড় বছরের খুকুর অশান্ত উপদ্রব বয়ে দিনগুলি মন্দ কাটে না।

কিন্তু জীবন সুধার স্রোত নয়।—বিশৃঙ্খলা বিষাদ ফাঁক পেলেই রুদ্র হয়ে ওঠে। ব্যাপারটি লঘু, বন্ধু সমীরের বিয়ে—সে এসে বলল "ভাই রমেশ! বৌদিকে না গেলে চলবে না।"

যথাস্থানে আরজি পেশ ক'রলাম, কিন্তু মঞ্জুর হল না। খানিকটা মিষ্টভাষা শুনলাম "এমন অভদ্রভাবে কারও বাড়ী আমি যেতে পারব না।"

গরীব ছাপোষা কেরাণী—নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, পান্তা আনতে নুন ফুরোয়। কিন্তু তরুণী বধূ অর্থ সমস্যার এই জটিল প্রশ্ন মানেন না। শ্বশুরমহাশয় যে চুড়ি ক'গাছি দিয়াছিলেন, সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে। অনেক-দিন ধরে তার জন্য বায়না হয়েছে, কিন্তু পেরে উঠিনি।

তিনি বলেন, "পারলেই পার—ইচ্ছে নেই তাই!" তা হয়ত সত্য, চাঁদার খাতা থেকে হাত গুটালে—দূর সম্পর্কের আত্মীয়গুলির মাসহারা বন্ধ করলে তা হয়ত পারা যেত কিন্তু আমি 'ইকনমিকস্' পড়িনি—পড়েছি কাব্য, তাই পারি না। কলহ চলে, কিন্তু এ ত উপন্যাসের কলহ নয়, মিলনান্ত হয়ে ওঠে না। সমীর মুখ ভার করে ফেরে।

মন ভার করে বসি। খুকু আসে, হাসে আর বড় বড় কালো চোখ দুটি মেলে বলে "বাবা! মা যাই।" দুঃখ ভুলি, ওকে কোলে তুলি, পাপড়ি হাসে আর গান করে 'পা ধা নি।'

—দুই—

সঙ্কল্প করিলাম, ব্যবস্থা করিব।

মনের আনন্দে এতদিন সাহিত্য রচনা করেছি—পাখী যেমন গান গায়, এ তেমনই অবাধ আনন্দের উচ্ছ্বাস। এটা ছিল খেলা—। সমস্ত দুঃখের মাঝে মন বলে 'তুই হেসে নেচে গেয়ে বেড়া'—এ ছিল সেই খেলা।

ভাবিলাম লেখার বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিব। পল্লবদল-গৌর-করপদ্ম আভরণহীন থাকিবে—এ দৈন্য আমি ঘুচাইব।

কলিকাতায় দোকানে দোকানে ঘুরিলাম, সবাই বলে "না মশায়, কাব্য ও সাহিত্য চলবে না—নভেল আনতে পারেন ত দেখতে পারি।"

বিষণ্ণ মনে ফিরছি—কলেজের বন্ধু বলরাম পাঁজার সঙ্গে দেখা। বলরাম এখন বাংলাদেশের নামজাদা মানুষ। তার বইয়ের দোকান বাংলা সাহিত্যের ধাত্রী।—বড় বড় নামজাদা সাহিত্যিকের গুঞ্জনে তার মৌচাক মুখর। কিন্তু লজ্জাবশতঃ বলরামের কাছে যেতে পারিনি। বলরাম সমস্ত শুনে হেসে বলল "তা ঠিক নভেল নিয়ে এসো তা হলে একশ' টাকা দিতে পারব, কিন্তু—?"

আমি বলিলাম—"কি?"

"লেখার ডেফিনিসান জানত?"

"কি?"

"কুকুর মানুষ কামড়েছে এটা কোনই খবর নয়—খবর হল মানুষ কুকুর কামড়েছে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, সে বই চলবে যে বই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে—লজ্জা সঙ্কোচের যুগ চলে গেছে—বই যত বেপরোয়া গোছের হবে বাজারে সেটাই তত চলবে—বুঝলে?"

"আঁ"

"আঁর কর্ম্ম নয় ভাই—বৌদি তোমায় ভালবাসে—এ নিয়ে গল্প বঙ্কিমের যুগে চল্‌ত—শরৎ চাটুয্যের সাবিত্রী কিরণময়ীও আজকাল একান্ত সেকেলে হয়েছে—এদের চেয়ে চমৎকার সৃষ্টি চাই।"

মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, ভাবি বলি যে ছাগ-সাহিত্য রচনা আমার কর্ম্ম নয়। কিন্তু সুলেখার হাসি মুখের কথা মনে পড়ে। সরলা সুলেখা গহনা পেলে কি রকম খুসী হবে মনে করি। তাই বললাম—"আচ্ছা চেষ্টা দেখব।"

—তিন—

ঘরে ফিরি।

সব কাজ ফেলে উপন্যাস রচনায় হাত দিলাম। একখানি বিলাতী বই থেকে প্লট নিলাম—প্লটটী ঘোরালো—নায়িকা হল থিয়েটারের নর্ত্তকী—তার জীবনের গোপন রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপর হল উপন্যাসের গতি···। সমস্ত কাজ ফেলে লিখি।

মনে প্রাণে আমি বন্ধুহীন। ভাবালুতা বোধ হয়, তার জন্য দায়ী—সুলেখাকে ভালবাসি—কিন্তু সে ভালবাসা স্নেহ—আশ্রিতার প্রতি প্রীতি,

সেবিকার প্রতি আদর। সম-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিনিময় সে নয়। আমার পড়ার ঘরটি আমার নিজস্ব—এখানে শুধু পুস্তকের রাশি তাদের নীরব আলাপনেই আমায় মুগ্ধ করে।

সুলেখা আসে, বলে 'কি করছ ?'

বলি "না না, বিরক্ত করো না যাও।"

সন্ধ্যামেঘের মত অভিমানের লালিমা তার মুখকে ম্লান করে—সে ফিরে যায়।

খুকু আসে—আদরের পাপড়ি, কিন্তু অনাদরেই ফেরে। খুকু ডাকে "বাবা! বাবা…"

নায়িকার রূপের পসরা বিক্রয়ের গোপন কথা লিখ্‌তে ব্যস্ত উত্তর দিতে পারি না।

খুকু কাঁদে, বলে "বাবা! কোলে নেই।"

কোলে নিতে পারি না।

সময় নেই। সুলেখার মনের ব্যথা দূর ক'রব।

—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—

পাপড়ি কাঁদ কাঁদ মুখে আসে—চেয়ারের পায়া জড়িয়ে ধরে কাঁদে—"বাবা! কোলে নেই।"

অবোধ মেয়ে, কাজের গুরুত্ব বোঝে না, বলি "যাও মা খেলা করগে।" যায় না—হতাশ দৃষ্টি মেলে চায়। আদর করে বলি "যাও মা প্রহ্লাদের কোলে চড়ে বেড়িয়ে এস।"

প্রহ্লাদ চাকর তাকে বড়ই ভালবাসে।

খুকু ডাকে "পেল্লা! পেল্লা! ঐ বেড়া যাই।" অর্থ প্রহ্লাদ ওকে বেড়িয়ে নিয়ে আসুক।

প্রহ্লাদ মশলা পিষে, আফিসের ভাত চাই—কাজেই খুকুর কান্না চলে।

রাগ করি, বলি "ভাল আপদ, ওকে নিয়ে যাও।"

খুকুর মাতা রুদ্রচণ্ডী হয়ে আসেন—নিয়ে যান, কিন্তু খুকুর পিঠে পড়ে ……চড় চাপড়—করকাধারার মত।

কিন্তু উপায় কি—উপন্যাস শেষ করতে হবে। নর্ত্তকীর জীবনের প্রেমাভিনয়ের নগ্ন-সজীব চিত্র আঁকছি, এখন বাধা দেওয়ার অবকাশ কোথায়? সুলেখা রাগ করুক, কিংবা খুকু কাঁদুক—তার জন্য নাচার।

—চার—

অর্থ, সংসারে অর্থই সার।

বিদ্যা, রূপ, যশ সকলই অর্থবলের উপর। অর্থ চাই—লিখতে জুগুপ্সা হয়, কিন্তু উপায় কি, বাংলার তরুণ তরুণী রিরংসার ছবি চায়—বলরাম পাঁজা তারই রসদ জোগায়।

বলরামকে আস্‌তে লিখ্‌লাম।

চাটগাঁ মেলে সকাল আটটায় বলরাম এল—হাতে তার সুন্দর গোলাপ। এতবড় গোলাপ আমি জীবনে দেখিনি।

মর্চ্চেপড়া ফুলদানি ঘসে এনে তাতেই ফুলটা রাখ্‌লাম। চেয়ারে বসেই বলরাম বল্‌ল "চা আনতে বলো ভাই—ওটা না হলে কথাই ফুটবে না।"

চায়ের কারবার নেই—পাশের বাড়ীর গোবর্দ্ধন বাবুর কাছ থেকে সব আনাতে হ'ল।

বলরাম বই শুনে বল্‌ল—"হাঁ চলনসই হয়েছে—শেষ পরিচ্ছদটা একটু ঢেলে সাজ্‌তে হবে ভাই—পিতা ও পুত্র নর্ত্তকীর ঘরে এসেছে—পুত্র এসেছে আগে—নর্ত্তকী ধীরাকে না পেয়ে পুত্র সেজেছে নর্ত্তকীর পরিত্যক্ত সাজে—তার হৃদয়স্পন্দন অনুভব করতে—এমন সময় এল। পিতা—উন্মত্ত কামাতুর পিতা—তাহলেই বুঝেছ ক্যাপিটাল হবে"—"কিন্তু ভাই একশ'তে চলবে না—"

"একশ'র বেশী দেওয়া চলে না, তবে তুমি বন্ধু লোক—তাই বই ছাপা হয়ে বিক্রী হলে তোমায় আর একশ' দেব—তবে বুঝেছ ভাই ব্যবসা—ব্যবসা তাই একটা দলিল করতে হয়—আমি সবই [illegible] দশটা বাজে—চল কাজটা সেরে আসি—"

"তার আর কি দরকার ?"

"না হে না, ব্যবসা আইন মাফিকই [illegible]—"

"আচ্ছা চল তাহলে, কিন্তু খেয়ে দে[illegible]"

"না চল' কাজটা আগে সেরে আসি।"

বলরাম একশত টাকার নোট হাতে গুঁজে দিল। আনন্দে সুলেখাকে দিয়ে এসে বল্‌লাম—"এইবার তোমার মনোমত চুড়ি গড়িয়ে নাও।" ফিরতেই বলরাম বলল—"কিন্তু ভাই—বইটা রিভিসন করে দিতে হবে—নাঃ প্রথম বই হিসেবে খাসা বই হয়েছে—কলম এমন বেপরোয়া বাংলাদেশে কেউই চালাতে পারেনি—বুঝেছ রমেশ—এর পরের বইয়ের জন্য তোমায় পাঁচশ' টাকা দেব—এর চেয়েও একটা মজাদার বই লিখতে হবে।"

"বেশ তা লিখে দেবো।"

ভবিষ্যতের সোণার স্বপ্ন সমস্ত মনকে তখন রঙীন করে তুলেছে।

—পাঁচ—

রেজেষ্ট্রী আফিস থেকে ফিরতে বারটা বেজে গেল।

ফিরতেই দেখি—ফুলদানির সেই মস্ত গোলাপের পাপড়ি ছিন্ন ভিন্ন; রেগে চীৎকার করে বল্লাম—"প্রহ্লাদ! ফুলটা কে ছিঁড়েছে?" প্রহ্লাদের উত্তর নেই—সে হয়ত শ্রান্তদেহে নিভৃতে বিড়ি খাবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

কোণ হ'তে পাপড়ি উত্তর দেয় "বাবা!..."

খুকু খেলায় মত্ত, কাছে আসে না—অনাদরে হয়ত ভুল্‌তে বসেছে।

বলরাম চেয়ারে বসে বল্‌ল "যাক, হ্যাঙ্গামটা শেষ হল। তোমার খুকুটি ত বেশ—কিন্তু কি ছিঁড়েছে ও...!"

চাহিয়া দেখি—ওর হাতে টুকরা টুকরা কাগজ—

টেবিলের উপর আমার নগ্ন সত্যের' খাতা ছিল—সেটা সেখানে নেই।—

"হায় হায়! সর্ব্বনাশি! এ কি করলি—আমার সমস্ত শ্রম, সমস্ত চেষ্টা......"

ক্রোধে ওর পিঠে চড় বসিয়ে দিলাম। পাপড়ি ভয়ে ও ব্যথায় ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল—

ওকে মারতে মারতে স্থলেখার নিকট নিলাম। সমস্ত শুনে স্থলেখা বল্‌ল "ওকে মেরোনা—এই নাও টাকা ফিরিয়ে দাও।"

বলরাম বিরক্ত হয়েই ফিরে গেল—বলে গেল "ওটা আবার লিখে দিও।"

আর লিখিনি। খুকু যেন দৈবেরই অদৃষ্ট হস্ত—রিরংসার যে কামায়ন রচনা করে অন্তর ম্লান করেছিলাম—খুকু তা থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে।

লেখা ছেড়ে দিয়েছি। জীবনের প্রতিদিনের মাঝে স্ত্রী ও কন্যার সাহচর্য্যে যে কাব্য ফোটে—তারই পরিচয় নিয়ে নিজেকে সার্থক মনে করছি।

খুকুর সেদিনের ব্যথা মনে আছে। মাঝে মাঝে বলে "মা! বাবা মাইছে।" সুলেখা কথা কহে না—হাসে—আমিও হাসি…।
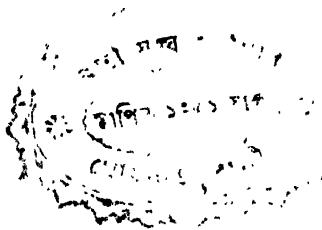
শেষ অভিনয়

—এক—

জলিল ও সলিল অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ব্যবধানের আড়ালকে তারা মানে নাই—গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেয় নাই—অভ্যস্ত আচারের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিয়া প্রাজ্ঞ সাজে নাই। অনেকে মন্দ বলে, বিদ্রূপ করে, কিন্তু উভয়ে হাসিয়া ওড়ায়।

জলিল বলে—"ভাই মানুষকে মানুষ বলে দেখিনি বলেই এই দুঃখ ও সমস্যা।" সলিল হাসে, উত্তর দেয় "থাক ভাই, তর্কে শত্রু বাড়বে।"

অভিনয়ের ক্ষেত্রে হৃদ্যতা—জলিল যেমন গায়ক, তেমন গায়ক মধুবন নাট্য সমিতিতে ছিল না, কাজেই জলিলের যথেষ্ট আদর—যবনিকার আড়ালে দিনের পর দিন উভয়ের বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

নূতন একটি নাটক অভিনয় করিতে হইবে বলিয়া সলিল জলিলকে খুঁজিতে গিয়াছিল—জলিল আজকাল আর স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিতে চায় না, সলিলের ইচ্ছা জলিল এই নূতন নাটকের নায়িকা সাজুক।

সলিল পৌঁছিতেই জলিল বলিল "এস ভাই—তারপর কি মনে করে।"

"তোমায় নায়িকা সাজতে হবে—তা না হলে এ বইটা কিছুতেই করা চলবে না।"

জলিল খানিকটা গম্ভীর হইয়া বলিল—'না ভাই সে আর হয় না—।' সলিল অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইবার ভয় করে নাই, বলিল, 'সে কি ভাই?'

'রাগ করো না সলিল, জীবনে আমার নূতন অভিনয় সুরু হচ্ছে!'

'তার মানে!'

'মিথ্যা নায়িকা নয়, সত্য নায়িকার আবির্ভাব হচ্ছে!'

'কই কিছুই ত বলিস নি ভাই—'

'আমিই যে জানতুম না'

শঙ্কা ও উদ্বেগের আবেশ উভয়কে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ করিয়া তোলে। সলিল ভাবাবেগে বলে—'তাহলে খুলে বল ভাই।'

'পাত্রী সরকারী চাকুরিয়ার মেয়ে—বাপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—মামা বলছেন আখেরে সুবিধা হবে।'

'তাহ'লে আর কি 'শুভস্য শীঘ্রম্' আর মিষ্টান্ন মিতরে জনা।'

'মিষ্টান্ন খেতে চাস—খাস, কিন্তু আমার যে মন সায় দিচ্ছে না।'

'কেন?'

'কারণ ওরা জেনানা যুগে বাস করছে—আমি থাকব বিংশ শতাব্দীর আর বধূ মধ্য-যুগের—তাহলে যে উভয়ের মাঝে লবণাক্ত সমুদ্রের আড়াল জেগে উঠবে।'

সলিল চুপ করিয়া রহে। ভাবিয়া বলে—'তা সত্য, কিন্তু তোর হবু শ্বশুর নিশ্চয়ই বর্ত্তমানের স্রোতকে আটকে রাখতে পারেন নি—'

'ভরসা কোথায়—মেয়ে বাংলা না পড়ে শিখেছে আরবী—চলতে গেলে ষ্টেসনে ষ্টেসনে চাই পর্দ্দার বিপুল আয়োজন—'

'এক কাজ কর না—কনে দেখে আয়।'

'সে হওয়ার জো নেই—আচারকে তিনি কিছুতেই ভাঙ্‌তে দেবেন না—'

সলিল ভাবে, পরে হাসিতে হাসিতে বলে 'তুই কথা দে যে অভিনয় করবি—তা হলে আমি কনে দেখার ব্যবস্থা করে দেবো।'

'কি করে ?'

সলিল উত্তর দেয়—'সে ভাবনা আমার, আজ সন্ধ্যার সময় যাস তাহলে বইটা এই সপ্তাহেই নামাতে হবে—'

জলিল মন মরা হইয়া উত্তর দেয়—'যাবো'। সলিলের আশ্বাসে তার অন্তর উচ্ছ্বসিত হয় না।

—দুই—

মৌলবী কাদির খাঁ মহকুমা হাকিম।—সৌজন্য ও সহৃদয় ব্যবহারে তিনি লোক-চিত্ত জয় করেছেন। তাই তাঁর গৃহে লোকের অবারিত দ্বার। তাঁর ছেলে মেয়েদের সাথে পাড়ার ছেলে মেয়েদের অন্তরঙ্গ সৌহৃদ্য।

ছুটির দিন বেলা দশটায় লীলা বেড়াইতে আসিয়াছিল—খাঁ সাহেবের তিন কন্যা রাবেয়া, সাকিনা ও সোফিয়া গল্প করিতেছিল। অন্তঃপুরে সহসা সৌম্য ও সুদর্শন এক ফকির প্রবেশ করিল। আরদালী জসিম আসিয়া জানাইল যে ফকির হাত দেখিতে পারে—তাই সাহেব তাহাকে ভিতরে পাঠাইয়াছেন।

লীলা চটুলা নব্যা মেয়ে। হাত দেখানোকে সে বুজরুকি মনে করে, তাই ফকিরকে ঠকাইবার জন্য সে নিজের হাত প্রসারিত করিয়া দিল এবং রাবেয়াকে বলিল 'বড়দি ফকিরকে আমার হাত দেখতে বল না।'

রাবেয়া বড়—সে ফকিরকে বলিল, দেখুন ফকির সাহেব বোনটির হাত দেখুন।

ফকির গম্ভীর হইয়া লীলার হাত ধরিয়া হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে লাগিল—পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে সে লীলাকে দেখিয়া লইতে লাগিল।

ফকিরের হাত মাঝে মাঝে কাঁপিতেছিল—ফকির গম্ভীর হইয়া বলিল 'আপকো জরুর সাদি হোগা—আচ্ছা দুলহা মিলবে মায়ি !'

ফকির আর কেহ নহে—জলিল। সলিল তাহাকে এমন করিয়া সাজাইয়াছিল যে জলিল আপনি আপনাকে চিনিতে পারে না—খাঁ সাহেবের মেঝ মেয়ের সহিত জলিলের বিয়ের কথা হইতেছিল—লীলার কথায় সে আন্দাজে লীলাকে ভাবী বধূ ভাবিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছিল—সজ্জা ও পোষাকের মধ্যে বিশেষ তারতম্য ছিল না—যেটুকু বা ছিল তাহা বিহ্বল জলিলের ধরিবার সাধ্য ছিল না। লীলা মুখে কাপড় দিয়া বলিল 'দুলহা হনুমান হোগা না খাপসুরত হোগা।'

জলিল নিজের রূপ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিত, কাজেই পুলকিত হইয়া বলিল 'খাপসুরত হোগা—'

কিন্তু অভিনয় করিতে জলিলের ভয়ঙ্কর অসুবিধা লাগিতেছিল তাই সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাঁচিল—আসিবার সময় সে সকলকে দেখিয়া লইল—লীলা সকলের চেয়ে সুন্দরী—সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া ঘরে ফিরিল।

—তিন—

সলিল মত দিল। জলিল তাই মামার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিল মামা সাদির ব্যবস্থা করিলেন।

যথারীতি কাবিলনামা হইয়া গেল। বরকে ভিতরে লইয়া গেলে আলোকিত কক্ষে পুরমহিলাদের সম্মুখে আয়নার ভিতর প্রথম পরিচয় হইল। জলিলের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

জীবনে এই এক অতি শুভ-মুহূর্ত্ত। রঙ্গমঞ্চে সে অভিনয় করিয়াছে—প্রেমের বক্তৃতা কত বলিয়া শ্রোতাকে ভাবমুগ্ধ করিয়াছে—কিন্তু সে অভিনয়—এ সত্য।

জলিল আকুল চিত্তে আয়নার দিকে চাহিয়া রহিল—পুরস্ত্রীরা রঙ্গ রসিকতা করিতে করিতে বধূর ঘোমটা খুলিয়া দিল—কিন্তু এ কি—জলিল আপনার চোখ মুছিল—এ ত তার নির্ব্বাচিত আকাঙ্ক্ষিত বধূ নয়।

কোথাও কি কোনও ভুল হইয়াছে? কিন্তু উপায় নেই—যে যাত্রা আরম্ভ হইল, সারা জীবন সেই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে—ফিরিবার পথ নাই—যে পথ আছে সে পথ জলিলের জন্য নয়।

জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী। উৎসব শেষে বর ও বধূ এক সঙ্গে মিলিয়াছে। বাহিরে কোকিল কুহুধ্বনি করে—পুষ্প-সৌরভ বাতাসকে মদির করে—কিন্তু বর ও বধূ নীরব ও নিঃস্পন্দ।

বধূ প্রথম সম্ভাষণের আনন্দের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহে কিন্তু জলিল কথা বলে না—বধূ ক্লান্তির আবেশে ঘুমাইয়া পড়ে। জলিল বসিয়া নিস্পলক নেত্রে জোৎস্নার দিকে চাহিয়া থাকে। শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্না কিন্তু তার

চোখে বিরাট অন্ধকার। সে জীবনে অনেক করুণ দৃশ্যের অভিনয় করিয়াছে, লোকের চোখে জল ঝরাইয়াছে। কিন্তু এখন একটী কথাও তার মনে জাগে না—মুখে একটী কথাও ফোটে না—সে নীরবে আপন অজ্ঞাতসারেই যেন নিজেকে ট্রাজেডির নায়ক করিয়া তোলে।

পরের দিন 'মণিকার' অভিনয় রজনী। জলিল বিবাহ করিয়া ফিরিয়াছে। সলিল আসিয়া ডাকিল—'ভাই প্রথম প্রণয়ের পেয়ালা পরে পান করো—এখন মণিকা সাজবার ডাক।'

জলিল আসিল—রুক্ষ বেশ, মুখে পাণ্ডুর বিষাদ। জলিল বলিল, 'আমায় ক্ষমা করিস ভাই—আর থিয়েটারে নামতে পারব না।'

সলিল শুনিল জলিলের চাকুরী হইয়াছে। জলিল নিত্য কলম পেষে—সলিল আর দেখা করিল না। বন্ধুত্বের মাঝে চীনের প্রাচীর জমিয়া উঠিল—কিন্তু কেহই আসল কারণ জানিল না।

দিন বহিয়া চলে—জলিলের জীবনও চলে কিন্তু কোথাও যে তার ফাটল আছে এ কথা কেহই জানে না।
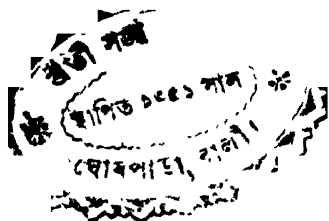
স্বামী

বৈশাখের মেঘস্নিগ্ধ প্রভাত। 'থিসিস' লিখিতেছি, দক্ষিণ পবন মল্লিকার শাখাকে দোলায়, দূরের আম গাছে কোকিলের ডাক শোনা যায়, কিন্তু সে দিকে মন দিবার সময় নাই।

লোকে বড় বলিবে, পণ্ডিত বলিয়া মানিবে তার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়াছি। খোকা আসিয়া বলে—'বাবা! ছবি দেখব।' উত্তর পায় না, টেবেল হইতে ছবির বই লইয়া খাটে বসিয়া খোকা ও খুকু ছবি দেখে ও গান করে।

সেকালের আর্য্যদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল—স্থলপথে ও জলপথে তাহাদের অবাধ বাণিজ্য ছিল—তাহাদের দল ছিল। সেই বণিক দলের কোম্পানী ছিল—বিশেষ বিশেষ আইন ছিল, কিন্তু সে আইন কি তাহাই খুঁজিয়া বাহির করাই আমার লক্ষ্য ছিল।

বোম্বে টাইপের দেবনাগরী অক্ষর পড়িতে গলদঘর্ম্ম হইতেছিলাম—কিন্তু তবু যশের লোভ মহতেরই ব্যসন।

শাড়ীর খস খস শব্দ শোনা যায়। বাতাস খানিক সুরভি গন্ধ ছড়ায়—তবু লেখা হইতে মুখ তুলিনা। ক্রোধ ও অভিমান জমিয়া ওঠে—গৃহলক্ষ্মী বলেন "শুনছ?"

স্মৃতিচন্দ্রিকার পুঁথিতে তখন মনঃসংযোগ করিয়াছি—অন্যমনস্ক ভাবে বলি—"হুঁ!"

"একটী মেয়ে এসেছেন—তোমার কাছে কিছু বলবেন।"

তেমনই অন্যমনস্ক ভাবে বলি "হুঁ!"

দেবানন্দ ভট্ট ৮।৯ শ' বছর আগে চমৎকার বই লিখিয়াছেন—কিন্তু ব্যবসায়ীদের বিশেষ আইনের কথা সেখানেও নাই।

অপরিচিত কণ্ঠে আবেদন আসিল "বাবা! আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

মুখ তুলিয়া দেখি অপরিচিতা মহিলা। বর্ষীয়সী কিন্তু তবু নিরাভরণ দেহের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। আমি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলাম "খোকন্ মাকে ডাক।" খোকন ছবির পাতায় মন দিয়াছে।

"মা! আমাকে এখানেই পাঠিয়েছেন—দেখুন, আমি বিপন্ন"—"কিন্তু! কিন্তু!"

"আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি—আজ চার পাঁচ দিন হল—আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন—।"

"আচ্ছা! তাকে বলব'খন—আপনি আমার স্ত্রীর কাছে সব বলে যান।"

"বাবা একটু মনে করে বলবেন"

আবার দেবানন্দ ভট্ট। কিন্তু—।

এবার বিরক্তির কণ্ঠ শোনা যায়—"মেয়েটি এসে কাঁদছে আর তুমি চুপ করে কি সব বাজে লিখছ?"

"বাজে, বল কি?"

"বাজে নয়ত কি, ওসব লিখে ফল হবে কি?"

'জান মনুর যুগে হিন্দুরা জাহাজ চড়ে ব্যবসা করতেন'—

ব্যবসার কথা এখন যাক—

"বল কি! এই জিনিষ যখন ছাপা হবে দেশ বিদেশের মানুষ অবাক হয়ে যাবে—"

"আর তোমার ছাপা বই উইয়ে কাটবে।"

ছোট বয়সে শাস্ত্রে সেকালের মানুষের প্রার্থনা শুনেছি দেহি ভার্য্যাং মনোরমাং মনোবৃত্তানুসারিণীম্। কিন্তু ইরা, সে নূতন যুগের বধূ—স্বামীর মনের ছন্দে ছন্দ মিলাইতে তার একটুও চাড় নাই।

একান্ত কুনো আমি। কোথায় কে স্ত্রীকে মারিল, তাহার তদারক কিভাবে করি!

তবু বাহির হইতে হইল। সহর বাড়িয়াই চলিয়াছে বাসার পাশেই রায় সাহেবের ঘর—সেখানে পাড়ার গল্প জমে—সেখানেই চলিলাম।

(২)

রায় সাহেব নিত্যধন বাবু বেশ মজলিসি লোক।

তাঁর ওখানে চা, গান ও গল্প লাগিয়াই আছে। যারা আসেন তারা রায় সাহেবের পূর্ব্বতম জীবনের অনেক কাহিনী শোনেন। "আসুন! উড্‌বার্ণের কথাই বলিতেছিলাম। সেবার আমি কটকে ছিলাম—উড্‌বার্ণ ছিলেন তখন কালেক্‌টার"—

আমি বলিলাম—'একটু বিশেষ কাজে এবং একটু গোপনীয় কাজে'—

পারিষদেরা উড্‌বার্ণ সাহেবের কাহিনীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল একে একে বিদায় নিল।

আমি ইজি চেয়ারে পা দোলাইয়া বসিয়া পড়িলাম। রায় সাহেব গোল্ডফ্লেকের কৌটাটি বাড়াইয়া দিলেন।

"ওঃ খান না বুঝি, আমিও খেতাম না, সেবার অগিলভ্ সাহেব একটা

গার্ডেন পার্টিতে সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন—করি কি সৌজন্যের খাতিরে নিলাম—সেই থেকেই সুরু"।

'দেখুন আমাদের পাড়ারই একটী মেয়ে'—

"না ওদের কথা আর বলবেন না—আজকাল মেয়েদের কি হল বলুন ত, স্কুলের মেয়ে চাঁদা করে থিয়েটার করবে—এটা কি ভাল ?"

"তাদের কথা নয়—একটা মেয়েকে তার স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে জানেন কি ?"

"এই আর জানিনে—এ আমাদের ভূদেবের কীর্ত্তি—"

"ভূদেব ! যে গাইয়ে—"

"হাঁ শুধু গাইয়ে নয়—ছোকরাটি একেবারে বিংশশতাব্দীর—"

"তার মানে ?"

"জানে, কেমন করে ফাঁকি দিতে হয়—সেবার সাহায্য রজনীর অভিনয় হল—ভূদেবই সব তোড়যোড় করলে—আমি বললাম, কিসের সাহায্য—ভূদেব হাসতে হাসতে বলল—সাহায্য ! আমরা খেতে পাইনে—আমাদের —তুখোড় ছেলে।"

"কিন্তু মেয়েটিকে একটু বড় সড় দেখলাম।"

"তাত দেখবেন—ও ওর বিয়ের বউ নয়—ওর নিকের বউ—"

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রায় সাহেব বলিলেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন—তবে ওরা দুটিতে আছে স্বামী স্ত্রীর মত—মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেনি "তবু···"

"ব্যাপার কি ?"

"সেবার জয় নগরের ছেলেরা গানের জোগাড় করল—ভূদেব গেল আসর জমাতে। যে বাড়ীতে আড্ডা হল—সেইখানেই ছিল ওর বউ—বিধবা, ৬।৭ বছরের একটী ছেলেও ছিল, কিন্তু হলে কি হবে—প্রেমের টান।"
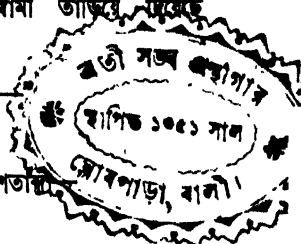
"বলেন কি ছেলে ফেলে কেমন করে এল—?"

"এসেছে, আর রয়েছে মনের সুখে। অনেকেই এ ইতিহাস জানে না।"

"কিন্তু সামাজিক বাঁধন—

"সহরে কে কার তত্ত্ব নেয়—?"

ফিরিলাম। মনের উৎসাহ অনেক কমিল। রায় সাহেব বলিলেন—"ও নিয়ে ভাবনা মিছে—দু এক দিনেই ওরা মিলিয়ে নেবে—মাঝে মাঝে বিরোধ না হলে প্রেম কি জমে?"

"জীবনের কথা বলছেন না বই-পড়া কথা?"

রায় সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"না না তবে সেবার প্যাটার্সন সাহেব বলতেন"।

(৩)

ইরা ফিরিতেই বলিল 'কি করে এলে'?

"জেনে এলাম কার স্ত্রী?"

'এই টুকু? সে ত আমার কাছ থেকেই জানতে পারতে'

'ভুল হয়েছে ক্ষমা করো'

'যাও, তুমি ভারি দুষ্টু হচ্ছ'

"এ অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না" পরে স্নিগ্ধস্বরে বলিলাম—

"মেয়েটিকে তুমি চেন?"

না চিনিনি কোনও দিন, বললেন এই পাড়াতেই থাকেন—ওঁর স্বামী কি বড় একটা বিজিনেস করেন—"

"তা করেন বই কি, ফাঁকি দিয়ে জীবন চালানো সেটা একটা মস্ত বিজিনেস—"

ইরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহে।

কৌতূহল অনিবৃত্ত রাখা শোভন নয়। ইরাকে বলিলাম, ইরা ক্রুদ্ধ ফণিণীর মত গর্জ্জিয়া ওঠে—"না না, এর ভিতর তুমি থেকোনা—এমন জানলে—"

আমার তপস্যার বিঘ্ন করতে না—এই ত ?

"কিন্তু ওই বা কেমন করে এলো ?"

"তুমি যাই বলো—মেয়েটির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা হচ্ছে—?" ইরার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমার প্রতি বিরক্ত দৃষ্টি মেলিয়া বলে "কেন ?"

"মেয়েটি ভূদেবকে স্বামী বলেই গ্রহণ করেছে"—

"তবেই স্বর্গে উঠেছি আর কি ? যাও যাও তুমি এ সমস্ত কেলেঙ্কারির ভিতরে থাকতে পাবেনা বলছি।"

"থাকতেই ত চাইনে—লোক সমাজের সঙ্গে চলা ত আমার কোষ্ঠীতে নেই—কিন্তু যখন এনে ফেলেছ, তখন কর্ত্তব্য করতেই হবে—"

'কর্ত্তব্য কি' ?

'জীবনে কামনা আছে—তাকে অস্বীকার করতে পারিনে—তোমার সেকালের মুনি ঋষিরাও তপোভঙ্গ করেছেন, তার কাহিনী ত জান, সেই সত্যকে যে সরলভাবে গ্রহণ করে তাকে আমি কখনই অবজ্ঞা করতে পারিনে'

'তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে'

'আমাদের সমাজে হামেশাই পুরুষ পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ করছে—তাতে কোনই দোষ হয় না—মেয়েদের বেলায় দোষ হবে কেন ?

পুত্রের পিতা যদি সংযমী না হতে পারেন—পুত্রের মাতাই বা কেমন করে হবে—?' জটিল সমস্যা—ইরা বিপন্ন হইয়া পড়ে, তবু সাহস সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধ করে :—

"তুমি তা হলে অসংযমের জয় জয়কার করতে চাইছ—?"

"না, তা চাইনি—সত্যকে গোপনতা দিয়ে অপমান করতে চাইনে, যে সাধুতা মিথ্যা, তাকে প্রশংসা করতে চাইনে—"

কিন্তু ছেলে ফেলে আসা কি নির্মমতা নয় ?

'ছেলে, আগের সংসারে সুখেই আছে—তাকে ওদের নূতন জীবনে এনে গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার কোনই হেতু নেই'

ইরা আমার কথাকে কিছুতেই হজম করিতে পারে না। ভারতীয় কৃষ্টির পূর্ণ সমর্থক আমাকে আধুনিকতার সমর্থন করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে জোর গলায় শুধু বলিল 'তুমি যাই বল—আমি একে বরদাস্ত করতে পারিনে—অমন করে স্বামীর জন্য উচ্ছ্বসিত কান্নাটি একেবারেই ন্যাকামি।'

"কিন্তু স্বামী কথার মানে জান কি ? নারী যার হাতে নিজেকে সঁপে দেয় সেই তার স্বামী—পুরুষ নারীকে পণ্য বলেই মনে করে নিয়েছে—তাইত সে স্বামী।"

ইরা কথা কহে না। রাগ করিয়া বিদায় লয়।

(৪)

সন্ধ্যার সময় ভূদেবকে ডাকাইলাম।

ভূদেব বলিল—"দেখুন আমার কোনই দোষ নেই'

"দোষের কথা বলছিনে—তোমার স্ত্রী পরের ঘরে ঘুরে বেড়াবেন নিরাশ্রিতের মত···এটা তোমারই কলঙ্ক···

'কিন্তু দেখুন অভাবের সংসার, খিটিমিটি একটু না একটু হবেই—সেটাকে মেনে নিতে হয়'

'আমি ত মানিয়ে নেই, উনি যে পারেন না—কারণ আজ্ঞে'—

ভূদেব মাথা চুলকাইতে থাকে। বলে 'ক্ষণিকের একটা ভুল'—

আমি বলিলাম 'আমি সব জানি, কিন্তু বিয়েটাও একটা ক্ষণিকের ভুল নয় কি? একটা অচেনা মেয়েকে সাত পাক দিয়ে ঘরে তুললেই কি তার মন জয় হয়ে যায়—তাকে ভালবেসে—তাকে শ্রদ্ধা করেই দিনে দিনে প্রেমের রথ্যা তৈরী হয়'

ভূদেব বলিল "আমার ভয় হচ্ছিল, কিন্তু আপনার কথাতেই সাহস হল, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"ওঁকে ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি—তবে জানেন ত অভাবের সংসার সেখানে প্রীতির চর্চ্চার চেয়ে কলহের চর্চ্চা হয় বেশী—"

আমি জানিতাম ভূদেব দক্ষ অভিনেতা। তার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করিল। বলিলাম "আমার দেবতত্ত্ব বই পাঁচশ কপি আছে। বইয়ের দাম আড়াই টাকা করে, তুমি একজন আর্টিষ্ট—ও থেকে দু'পয়সা ক'রে নিতে তোমার আটকাবে না।"

"আজ্ঞে, আপনার অনুমতি হ'লে তা পারব বৈ কি?"

আর কথা না বলিয়া হরিকে বই গুনিয়া আনিয়া দিতে বলিলাম। ভূদেব একটা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া বইগুলি নিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী আসিয়া (সে ইতিমধ্যেই তাহার স্ত্রীকে পাশের কোন বাড়ী হইতে জুটাইয়া

আনিয়াছিল) গড় হইয়া প্রণাম করিল। আমি উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিলাম—"আপনারা সুখী হন।"

ইরা রাগ করিয়া দু'তিন দিন আমার সহিত কথা কহিল না। দু'তিন দিন স্মৃতিতেই ডুবিয়া রহিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চাঁদের আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে, ইরা বসিয়া সমীর সেবন করিতেছিল—আমি বলিলাম "কি হে প্রচণ্ডে! তোমার দণ্ড কি এমনই নির্ম্মম থাকবে?"

"যাও আমার সঙ্গে কথা কয়ো না—আমি ত তোমার ক্ষণিকের ভুল।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"ক্ষণিকের ভুল বটে, কিন্তু ভুল যে সব সময় খারাপ হবে একথা ত বলিনি, আমার ভুলই আঁধার ঘরে চাঁদের আলো এনে দিয়েছে।"

ইরার রুদ্ধ ক্রোধ জল হইয়া গেল। সে হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল—কিন্তু তবুত তুমি স্বামী? 'না, স্বামিত্বের দাবি করি নে, কাল চলেছে তার রথ-ঘর্ঘরকে অবজ্ঞা করবার দুঃসাহস একটুকুও আমার নেই'।

সন্ধি হইল। কিন্তু ভূদেবদের কথা আর কখনও উঠিবে না—তাহাই সন্ধির সর্ত্ত হইল।

পথের বার্তা
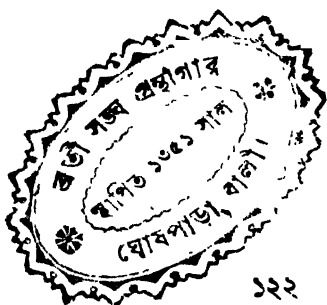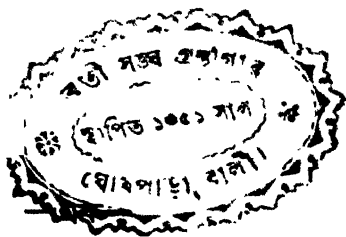
[উপন্যাস]

ঋতুচক্র ফাল্গুনে আসিয়া থামিয়াছে।

নবজীবনের ঐশ্বর্য্য পুষ্পে, পত্রে, পল্লবে নবজন্মের সূচনা করিতেছে। নির্ম্মল নীল আকাশ, গন্ধমদির বাতাস, তৃপ্ত-বিহগের কলকূজন বসন্তের সুষমাকে অন্তরের দ্বারে আনিয়া দিয়াছে।

মল্লারপুরের একখানি কুটীরে স্বামী ও স্ত্রী বসন্তের এই প্রথম দিনকে আনন্দে ও উৎসাহে বরণ করিয়া লইল।

নিরুপম পড়ার ঘরে বসিয়া বিলাতী একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। লেখকের লিপিচাতুর্য্য তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া গল্পের নায়ক নায়িকার সহিত ভাবের তরঙ্গদোলায় দুলিতেছিল।

ধীরা আসিয়া বসিল। প্রভাতের জ্যোতির মত দীপ্ত, আলুলায়িত কুন্তলের মাঝে তাহার অপূর্ব্বসুন্দর মুখখানিকে মেঘাচ্ছাদিত শশাঙ্কের মত মধুর দেখাইতেছিল। সদ্যস্নাত ধীরার লাবণ্যে যেন বসন্তের প্রথম আবির্ভাব গৌরবময় হইয়া উঠিতেছিল। স্বামী তথাপি পুস্তকের মাঝে মন হারাইয়া বসিয়া আছেন। ধীরা বই টানিয়া লইয়া বলিল 'আজ পড়া রেখে দাও ফাল্গুনের এই প্রথম সঞ্চারকে এমন করে অবজ্ঞা করো না।'

নিরুপম স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিল, 'কি করতে বল ধীরা ?'

স্বামীর প্রীতি-বিহ্বল সম্ভাষণ ধীরাকে তৃপ্ত করিয়া দিল। ধীরা কণ্ঠকে মধুর করিয়া জবাব দিল 'আজ বিয়ের পরে নূতন ফাল্গুন এসেছে, এস এই বসন্তকে আমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করি।'

নিরুপম অবাক হইয়া চাহিয়া রহে। ধীরার ভাব-সুনিবিড় গাঢ়

কণ্ঠস্বর তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলে। অতীতের তুচ্ছতার কথা স্মরণ-পথে পড়ে। অভাবের সংসারে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব ও কলহের শত ইতিহাস আছে। আজ সে সব ভুলিয়া ধীরা যেন নূতন জীবন যাপন করিতে চাহে। নিরুপম তাই উৎসাহিত হইয়া বলে 'বেশ!'

স্বামীর আদর ধীরাকে মুগ্ধ করে। সে হাসিমুখে বলে 'গ্লোব নার্শরী থেকে একটা আমেরিকান বিউটির কলম এনেছি, আজ সেই গোলাপ গাছ তুমি নিজে পুতবে। কেমন মজা হবে না?'

নিরুপম অপ্রতিভ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহে। ধীরা আনন্দ-গদগদকণ্ঠে বলে 'তরুলতা যে আমাদের জীবনে কত আনন্দ দিতে পারে, আমরা তা অনুভব করি না! আমি মনে করেছি কি জান, আমাদের সামনের উঠানটায় একটা ভাল রকম বাগান করতে হবে। তুমি ভাবছ আমি পারব না, তা নয়। আমাদের বাসায় যে বড় বড় ডালিয়া ফুল দেখেছ, সেগুলি আমার হাতেই পোতা।'

'সে বেশ হবে, কিন্তু বিলেতী মরসুমী ফুলের চেয়ে বেলের কেয়ারি করলে খুব ভাল হয়, যেমন মিঠে গন্ধ পাবে, তেমনই দেখতে শোভন হবে।'

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের যে অদৃশ্য যবনিকা দেখা দিতেছিল, আজিকার এই লঘু আলাপ তাহা সম্পূর্ণ শেষ করিয়া দিল। নিরুপম ও ধীরা উভয়েই তাহাদের প্রথম-প্রণয়ের উচ্ছ্বাস-আবেগ পুনরায় অনুভব করিতে আরম্ভ করিল।

বিকালে ফুল গাছ পোতা হইল। নিরুপম কোদাল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া গাছটীকে বসাইল, ধীরা মাটী দিয়া গোড়া শক্ত করিয়া দিল। তাহার পর জল দিয়া দিল।

কলম পোতা শেষ হইলে ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল ‘এই গাছের একটা নাম দিতে হবে। তোমার কি নাম পছন্দ হয় ?’

নিরুপম পত্নীর শিশুসুলভ সরলতায় পুলকিত হইয়া ওঠে। বিহ্বলচিত্তে ক্ষণিক তাহার জ্যোতির্মণ্ডিত মুখে, চাহিয়া রহে, পরে তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্যে বলে ‘গাছের আবার কি নাম হবে ?’

ধীরা কৌতুককে এড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলে ‘না, তুমি বুঝছ না, এর একটা নাম চাই। প্রতিদিনের আলো বাতাসে এই গোলাপ-শিশু যেমন বাড়বে, তার পরিণতি আমাদের মনের চারিপাশে একটা আনন্দের আবহাওয়া বহাবে। নাম না থাকলে ওর কথা আলোচনা করার অসুবিধা হবে।’

‘তুমি যে শকুন্তলা হয়ে উঠলে দেখছি। বেশ তাহলে শকুন্তলার মত একে বন-জ্যোৎস্না বলে ডাকবে। এই তোমার প্রথম সন্তান—আদরের দুলালী মেয়ে।’

লজ্জায় ও পুলকে একটী আরক্তিম আভা ধীরার গৌর আননে বিভাসিত হইয়া উঠিল। কি যেন কি আবেশে সে খানিক ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া রহিল, পরে বলিল ‘যাও তুমি ভারি দুষ্টু। অমন করলে ভাল হবে না বলছি।’

নিরুপম হাসিতে হাসিতে উত্তর করে ‘বা, এতে আর রাগের কারণ কি ? কেমন নাম পছন্দ হয়েছে ত ?’

‘তা ভালই হয়েছে। বন-জ্যোৎস্না ভারি সুন্দর নাম, চাঁদের আলোর মত এর ফুল আমাদের কাননকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল করে রাখবে। সত্যিই খুব ভাল নাম হয়েছে।’

‘তাহলে আমায় কি পুরস্কার দেবে বল ?’

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল 'বা, তুমি যে বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছ দেখছি। তা থাক, ঝগড়া করে কাজ নেই, আজ যে তোমার খাবার জন্ত "আবার খাব সন্দেশ" করেছি, চল এইবারে খাবে।'

· মালীকে গোলাপের চারিপাশে ভাল করিয়া বেড়া দিতে বলিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিল। নিরুপম বারান্দায় ইজিচেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

ধীরা একটী টিপয় করিয়া নিজের হাতের তৈরি খাবার আনিয়া দিল। নিরুপম বলিল, 'আর একটা চেয়ার টেনে নাও, তুমিও বসে পড়।'

ধীরা বসিল না, বলিল 'আমি তোমায় বাতাস করছি, তুমি খাও।'

নিরুপম বলিল 'তাহলে আমি খাব না বলছি।'

ধীরা অনুনয়ের স্বরে বলিল 'না রাগ করো না, তুমি খাও আমি তোমায় বাতাস করছি।'

নিরুপম রাগের ভান করিয়া বলিল 'ব্যাপার কি বল ত ?'

ধীরা সঙ্কোচজড়িত দ্বিধায় উত্তর দেয় 'আজকের দিনে সাহেবিয়ানা করতে চাইনে, আজ আমাদের বিয়ের তিথি।'

নিরুপম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল 'এই সভ্য বিংশ শতাব্দীতেও তুমি মধ্যযুগের বর্ব্বরতা নিয়ে থাকতে চাও দেখছি। ওসব পাগলামি রেখে দাও।'

ধীরা নম্র হইয়া বলিল 'না, সত্যিই তুমি আমায় মাপ করো। আজকের দিন হিন্দু নারীর মত হয়ে তোমায় সেবা করতে দাও।' এই বলিয়া ধীরা গড় হইয়া নিরুপমকে প্রণাম করিল।

নিরুপম অবাক হইয়া গেল। শিক্ষিতা, নব্যা নারী ধীরার এ কি অদ্ভুত খেয়াল, ভাবিয়া নিরুপমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু তাহার সহিত তর্ক করা বৃথা জানিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল।

খাওয়ার সময় ধীরা 'এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া আবদার করিল। নিরুপমও প্রসন্নচিত্তে পত্নীর আবদার শুনিল।

গোধূলির আলো বারন্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে ধীরার গোলাপী অধর আরও রক্তিম দেখাইতেছিল। পত্নীকে বুকে টানিয়া নিরুপম বলিল 'প্রণাম ত হয়েছে, আমি কি আশীর্ব্বাদ করব?'

ধীরা কথা কহিল না। চুপ করিয়া বলিষ্ঠ স্বামীর প্রেমাকুল আলিঙ্গনের মধ্যে এলাইয়া রহিল, কহিল 'আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন সতী হই।'

—দুই—

পুরাতন ইতিহাসটা খানিক জানা প্রয়োজন।

বৈশাখ মাস। কৃষ্ণচূড়ার রঙীন ফুলে তাহাদের বারান্দা ঢাকা পড়িয়াছিল, সম্মুখের অশ্বত্থগাছে বাজ পাখী বসিয়া আহারের সন্ধান করিতেছিল। ধীরা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিল।

বইটি সুন্দর—লেখক পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। মানুষ যত সব প্রতিষ্ঠান করিয়া সভ্যতার নিশান উড়াইতেছে, লেখকের মতে সে সব প্রতিষ্ঠান আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা আশা ও আদর্শ সকলই পরিবর্ত্তন করা উচিৎ। নচেৎ একদেশদর্শী সংস্কারে কিছুই হবে না। ধীরা মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল।

ধীরা তখন আই-এ পড়ে। কিন্তু অধ্যাপক পিতার সাহচর্য্যে পঠনেচ্ছা তাহার অসাধারণ বাড়িয়াছে, তাই এই সমস্ত কঠিন সমস্যামূলক গ্রন্থও সে অবলীলাক্রমে পড়িয়া রসগ্রহণ করিতে পারে।

বন্ধন ও মুক্তি

লেখক বলিতেছেন—'আসক্তিই সংসারে দুঃখের মূল—সর্ব্ব কালের ও সর্ব্ব দেশের সাধু ও মনীষিরা বলেছেন অনাসক্তিই দুঃখ নাশের মূল। মানুষের সৃষ্টিকামনা যখন স্বার্থে কলুষিত, তখন সে মানুষকে আবদ্ধ করে—তাকে পশু করে—'

ধীরার মনে হইল—গীতায় ভগবান এমনই কথা বলিয়াছেন—য়ুরোপীয় লেখকও গীতার কথার পুনরুক্তি করিতেছেন—বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া সে চাহিল—জনবিরল রাজপথে ক্বচিৎ লোক চলিতেছে। বাজ পাখী কখন উড়িয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে একটি কোকিল আসিয়া মোহন সুরে ডাকিতেছিল—কু-উ, কু-উ।' ধীরা আবার পাতা খুলিল, লেখক বলিতেছেন—'কাম যখন শারীরিক পিপাসা, তখন সে অনর্থমূল। মানুষ যখন দেহকে বড় করে দেখে, তখন সে নিজেকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করে দেখে, সমস্ত ও সমগ্রকে তখন সে অবজ্ঞা করে—তাই কাম তখন মানুষকে ছোট করে, হেয় করে। পরিপূর্ত্তিতে সে তৃপ্তি পায় না—সে বাড়ে,—'

ধীরার মনে হইল, পিতা বলিয়াছেন ভারতবর্ষের শিক্ষাও এমনই ভূমার শিক্ষা। পিতার উপদেশ মনে পড়িল—'যা ভূমা তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই।'

এমন সময় পিতার কণ্ঠ শোনা গেল—'মা দরজাটা খোল ত', বাবা যখনই আসেন, দোর খুলিতে কন্যাকেই ডাকেন। ধীরা উঠিয়া চাহিল, দেখিল পিতা একা নহেন, পিতার সহিত সুন্দর বলিষ্ঠ একটি যুবক। যুবক ধীরার দিকে চাহিল, ধীরাও চাহিল চারি চোখের মিলন হইল।

ধীরা আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু এ অনুভূতি বেশীক্ষণ উপভোগ করিবার অবসর হইল না—পিতার কণ্ঠ পুনরায় শোনা গেল। ধীরা ত্বরিতপদে নামিয়া গেল।

অধ্যাপক শিবনাথ কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'নিরুপমকে নিয়ে এলুম মা।'

ধীরা কথা কহিল না শুধু হাত দু'টি জোড় করিয়া উদ্দিষ্টকে নমস্কার করিল। নিরুপম সৌন্দর্য্যময়ী ধীরাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, মেয়েদের সাথে আলাপ-পরিচয় ছিল না—খানিক পরে আত্মস্থ হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল।

ড্রইংরুমে বসিয়া শিবনাথ বলিলেন—'নিরুপম বাঙালীর মুখ রেখেছে, তাই আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে, এজন্য ওকে নিয়ে এলাম, আজ দুপুরে নিরুপম এখানেই থাবে মা—' ধীরা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে এই বাঙালীর মুখোজ্জলকারী বীরকে দেখিয়া লইল, কিন্তু কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিল না—নিরুপম নম্রমধুর স্বরে বলিল—আপনি আমায় খুব বাড়িয়ে তুলেছেন—এ আর এমন কি।

'শোনো ধীরা তোমাকে world federation of students সমিতির কথা বলেছি না—'

'বলেছ বাবা'—

'হাঁ সেদিনই বলেছিলাম যেদিন নিশীথ এসেছিল—এই বিশ্বছাত্রসঙ্ঘ একশ পাউণ্ডের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল—ছাত্রদের ভাবী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখে নিরুপম সে পুরস্কার পেয়েছে, এতে বাংলার গৌরব মা—গৌরব আমাদের কলেজের—গৌরব আমার—' বক্তার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিরুপম লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, ধীরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'উনি আমায় ভালবাসেন'।

ধীরা লঘু আনন্দে উত্তর দিল, 'আপনি সম্মানের পাত্র।'

'না এ সম্মান সবই আপনার পিতার প্রাপ্য আমার লেখায় যা বলেছি 'সবই ওর কাছে শেখা—'

শিবনাথ খুসি হইয়া উঠিলেন 'বেশ বেশ, গুরুকে শ্রদ্ধা করো—জানো এটা একটা Mystic illumination—মানবে একথা, আরুণি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু সবাই এই তত্ত্বের উদাহরণ—গুরুর আশীর্ব্বাদ শিষ্যের অন্তরে সত্যকে প্রতিভাত করে—কিন্তু খুবই আনন্দ হয়েছে আমার—জান আমাদের শাস্ত্র বলেছেন—শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।

শিবনাথ হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক, দর্শনের ছাত্র নিরুপমের বিজয় তারই বিজয় এ ধারণা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন না।'

ধীরা প্রশ্ন করিল 'আপনি আপনার প্রবন্ধে কি বলেছেন ?'

নিরুপম খুসি হইল। এই তরুণীর স্নিগ্ধ আয়ত চক্ষু দুটিতে যে উৎসাহ—তাহাই তাহার সাতিশয় পরম গৌরব। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'ভারতবর্ষের আত্মসমাহিত বিজয়ের কথা বলেছি—সুখে দুঃখে জয়ে পরাজয়ে স্থিতধী থাকাই বড় কথা—।'

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল 'বাবা, য়ুরোপ আমাদের এই শিক্ষাই নিচ্ছে, এই বইটা পড়ছি এতে ঠিক এই কথাই বলেছে।'

'বলবে না মা! বলবে বিশ্ব জগৎ আজ ক্ষুব্ধ কাঙ্গাল—পশ্চিম গড়েছে যন্ত্র, [illegible] কৌশলই তাকে মরণের পথে টানছে, য়ুরোপ আজ মৃত্যুর পথে ছুটছে, তাকে বাঁচাবে কে? —বাঁচাবে ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ তার অমৃতত্বের শিক্ষা দিয়ে—তার ত্যাগ ও সত্যের বাণীতে—' বক্তৃতা হয়ত থামিত না, ধীরা বাধা দিয়ে বলিল 'যাই বাবা খাবার কি হ'ল দেখি।'

শিবনাথ চসমা খুলিয়া খাপে পূরিতে পূরিতে বলিলেন 'তাই দেখ মা—নিরুপম যাবে কিছু খেয়ে যাক।'

ধীরা উত্তর দিল না—দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।
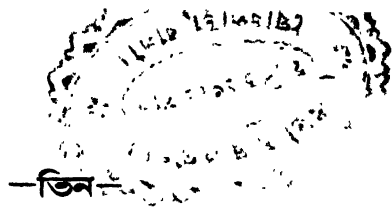
—তিন—

নিরুপম বইটি কুড়াইয়া নিল। অধ্যাপক শিবনাথ দৈনিকে মনোনিবেশ করিলেন—এমন সময় জুতার মস মস শব্দে উভয়ে চকিত হইয়া পড়িলেন। নিরুপম আগন্তুককে চেনে না। শিবনাথ বলিলেন 'তোমরা বুঝি পরস্পরকে জাননা—এ হল নিশীথ, টেনিস চ্যাম্পিয়ন।'

নিরুপম ঔদাস্যে বলিল 'আমি খেলার বড় খবর রাখিনে।'

নিশীথ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল 'তা রাখবেন কেন—বই মুখস্থ করেই আপনারা দেশোদ্ধার করবেন।'

কথাটি যেমন তিক্ত তেমনই অপ্রিয়! নিরুপম ধীরে ধীরে বলিল 'দেশোদ্ধারের কথা ত হচ্ছে না—একটা লোকের পক্ষে সংসারের সব খবর রাখা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়!' টিটকারিতে নিরুপমের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু চুপ করাই সে সঙ্গত মনে করিল।

নিশীথের আস্ফালন চলিল—'য়ুরোপে একজন চ্যাম্পিয়ন দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মান পায়, আমাদের দেশে তাদের এমনই আদর।'

শিবনাথ শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন 'নিরুপম তোমায় অনাদর করেনি।'

নিশীথ! ও বইয়ের পোকা—বাইরের খবর বড় একটা রাখে না, নইলে নিরুপম খুব ভাল ছেলে—world federation ওকেই পুরস্কার দিয়েছে।'

নিশীথ তবু সান্ত্বনা মানে না 'একে কি আপনি শিক্ষা বলবেন—কেবল বই পড়ে কি জগৎ চেনা যায়—য়ুরোপের ছেলেরা কত জানে, কত শেখে।'

শিবনাথ নিশীথের এই আস্ফালনকে পছন্দ করিতেছিলেন না। তর্ক থামাইবার জন্য বলিলেন 'তর্ক থাক, তুমি এখান থেকে খেয়ে যাবে আজ, নিরুপমকে বলেছি। ভজুয়া ওরে ভজুয়া—'

'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না—আজকে আমার খাওয়া সম্ভব হবে না। বিকালে সাউথ ক্লাবে টিল্ডেনের সঙ্গে আমার খেলা হবে, আপনারা যাবেন আমি তিনটের সময় আসব।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নিশীথ ঠক ঠক করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িল।

শিবনাথ নিরুপমকে বলিলেন 'নিশীথ খুব ভাল ছেলে তবে খেলার নামে অজ্ঞান, তাই ও মনে করে জগৎ-সংসার খেলায় মাতবে—তুমি ত রাগ করনি।'

নিরুপম হাসিয়া উঠিল, বলিল 'না, তবে খেলোয়াড়ের এমন অসহিষ্ণুতা ভাল নয়।'

'ভাল ত নয়ই কিন্তু ওকে কিছুতেই বুঝানো যাবে না যে এটা অন্যায়।'

'কার কথা বলছ বাবা ?'

সদ্যস্নাতা কিশোরীর লাবণ্য নিরুপমকে মুগ্ধ করিল। ছিপছিপে গড়ন, চুলগুলি ভ্রমরের মত কালো, আর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মুখে কালো কালো চোখদুটি ধীরাকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিল।

শিবনাথ বলিলেন 'নিশীথের কথা বলছি মা, আজ আমায় তার খেলায় বিকালে যেতে নিমন্ত্রণ করে গেল।'

নিশীথের নামে তরুণীর মুখে ব্রীড়ার রক্তিমাভা বহিয়া গেল। মুগ্ধ নিরুপমের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না।

নিরুপম স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে যেন গতযুগের রোমান্সের নায়ক ; তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সে জয় করিয়াছে—কুচ-বরণ কন্যা, যার মেঘ-বরণ

চুল—কিন্তু এমন সময় যেন ব্যাঘাত আসিল, আসিল রাক্ষস—নিরুপমের মনে হইল নিশীথই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষস।

ধীরা বলিল 'যাবে ত বাবা?'

শিবনাথ কন্যার আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চাহিলেন, নিশীথের অভিমানের কথা ভাবিলেন, বলিলেন "ভেবেছিলাম বিকালে নিরুপমকে আমার নূতন বইটি পড়ে শুনাব—কিন্তু না গেলে নিশীথ রাগ করবে, তাই মনে করেছি—।"

'না বাবা নিশীথ বাবুর অভিমানও যেমন সহজে হয়, গলেও যায় তেমনই সহজে—আমি তাকে বুঝিয়ে বলব, তাহলে তিনি রাগ করবেন না।'

'বাঁচালে মা, বইটি লিখে মনটা খুব ব্যাকুল, ভাবছি অনেক নূতন কথা লিখেছি, অনেক নূতন সত্য বের করেছি; কিন্তু জানত মা—আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।'

ধীরার আগ্রহ নিরুপমের ভাল লাগিল না—সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল 'তার দরকার কি আমি আর একদিন আসব স্যার, আপনি যান।'

শিবনাথ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

ধীরা বলিল 'তোমার দেরী সইবে না বাবা—আমার কোনই অসুবিধে হবে না, সেখানে ত আরও অনেক মেয়ে আসবে।'

শিবনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। নিরুপমকে বলিলেন 'বইটির নাম দিয়েছি, 'ভারতের প্রাণ'—ভারতের সংস্কৃতির বহুমুখী সমৃদ্ধির কথা বলতে চেষ্টা করেছি, তোমার ত কাজ নেই নিরুপম?'

'না তেমন কাজ কি, তবে আমি না হয় রাত্রে কিংবা কাল আসব, আপনি খেলা দেখতে যান, সেইটেই বোধ হয় ভাল হবে।'

ধীরা বুঝিল না, এই শান্তদর্শন ছেলেটি যেন অভিমান করিতেছে। ধীরা অভিমানের কারণই বুঝিল না। সে অপরিচিত আগন্তুক, তাহাদের জীবনের

গোপন কথায় সে কেন নিজকে এমন করিয়া ছড়াইতে চাহে। সে হাসিতে হাসিতে বলিল 'আপনি বাবাকে চেনেন না, যতক্ষণ ওঁর বই না শুনছেন, ততক্ষণ আপনার স্বস্তি নেই, চলুন হাত মুখ ধুয়ে নেবেন, খাবার তৈরী হয়েছে।'

নিরুপম গরীবের ছেলে। পাড়াগাঁয়ে থাকিত। সেখানে বৃত্তি পাইয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছে—হিন্দু হোষ্টেলে থাকে, অভিজাত মানুষের জীবনের সহিত কোনই পরিচয় নাই। অধ্যাপকের গৃহে বর্ত্তমানের জীবনযাত্রার সৌষ্ঠব মুগ্ধ করিল। নূতন দেওয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া সে আরসীতে আপন মুখ দেখিয়া লইল, চুলগুলি এলেমেলো—গন্ধ-তেল দিয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া লইল। যখন বাহির হইল তখন মনে হইল, সে ভদ্র ও সুবেশ হইয়াছে।

খাইতে বসিয়া শিবনাথ বলিলেন 'আমার মা শুধু পড়তে পারে তা নয়—'

ধীরা চোখের ইঙ্গিতে পিতাকে বারণ করিল, কিন্তু কন্যার গুণ-গৌরবতৃপ্ত পিতা সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন না। উৎসাহে বলিয়া বসিলেন 'কেমন লাগছে মোচার চপ, এতে আমার মা ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পেতে পারে, কি বল নিরুপম?'

নিরুপম বলিল 'চমৎকার, এমন আর খাইনি।'

ধীরা নিরুপমের এই অসভ্য উত্তরে বিরক্ত হইল। কিন্তু আত্মপ্রশংসা বিরক্তিকে দাবাইয়া রাখিল, বলিল 'আর কয়েকটি দেই?'

নিরুপম হাত নাড়িয়া বলিল 'না অনেক খেয়েছি।'

ধীরা শুনিল না, এই পরিতৃপ্ত অতিথিকে সে পরিবেশন করিয়া আনন্দ সঞ্চয় করিবে, তাহাতে বাধা ছিল না, কারণ নিরুপম খাইতে পারে।

খাওয়ার সময় চিঠি আসিল, শিবনাথ বলিলেন 'দেখ ত মা কি ?'

ধীরা দেখিল সে নিশীথের চিঠি, ধীরার সহিত দেখা হয় নাই, নিশীথ রাগ করিয়াছে সে অনুমান করিয়া লইল 'বাবা আপনিই পড়ুন।'

ভজুয়া শিবনাথকে খাম খুলিয়া চিঠি দিল। শিবনাথ পড়িলেন নিশীথ লিখিয়াছে, সে আসিতে পারিবে না, তাহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে যেন ঠিক সময়ে আসেন।

শিবনাথ বুঝিলেন 'এ নিশীথের অভিমান।' ধীরাও বুঝিল। পিতাকে যে আশ্বাস দিয়াছিল, সে ভরসাও নিঃশেষ হইয়াছে। লজ্জায় তাহার মুখ পাংশু হইয়া উঠিল।

নিরুপম বুঝিল, সে ধূমকেতুর মত এই সুখী পরিবারে কেবল অশান্তির আলোড়ন জাগাইয়াছে।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। নিরুপম অবশেষে বলিল 'আমার ভুল হয়েছিল সার, বিকালে আমার কাজ আছে, আমায় এখনই যেতে হবে।'.

শিবনাথ চকিত হইয়া উঠিলেন, বিভ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন 'কাজ আছে ? বেশ তুমি আর একদিন এসো।

'আসব কিন্তু এখনই আমাকে যেতে হবে।'

—চার—
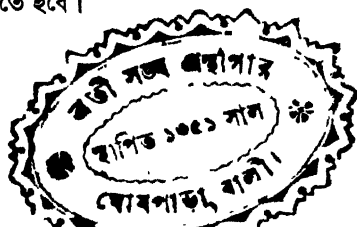
অলস নিদাঘের অলস মধ্যাহ্ন—ধীরা আপন শয়নকক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল, সম্মুখের পথ দিয়া লোক চলে, তাহাদের লীলাবিচিত্র গতায়াত চোখে পড়ে, কিন্তু আজ চলার কৌতুকটি মনে লাগিতেছিল না—আজ সে নিশীথের কথাই ভাবিতেছিল।

রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া চলিয়াছে, কয়েকটি গরু এখনও খোলা মাঠে বিচরণ করিতেছে, পাশের দোকানে দোকানী কৃত্তিবাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

সমস্ত পরিবেশ শান্তির আবহাওয়া ঢালিতেছিল, তবুও ধীরা স্বস্তি পায় না। নিশীথের এই অকারণ রূঢ়তা তাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। নিশীথের সহিত মিলনের যে সম্ভাবনা তাহার মনে পুলক সঞ্চয় করিত, তাহার মধ্যে কর্ত্তৃত্বের এই অভিমান আকস্মিক আসিয়া তাহাকে পীড়িত করিল।

বিকালের খেলা দেখিয়া উৎসাহ তাহার রহিল না, সে উঠিল। টেলিফোন ধরিল 'হেলো বড়বাজার ৪৩৭৫।'

'হ্যালো—আমি নিশীথ—কে?'

'বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'তাহলে বুঝে কাজ নেই—আমরা আজ খেলা দেখতে যাব না।'

নিশীথ বুঝিল, যে আঘাত সে দিয়াছে, ইহা তাহারই প্রতিঘাত। কাতর-কণ্ঠে বলিল 'না না, সে হয় না—এমন খেলা হয়ত জীবনে খেলতে পারব না।'

'কিন্তু আমাদের সুবিধে হয়ে উঠবে না।'

'ধীরা! এমন করে দূর করে দেবে—ক্ষমা করবে না—'

'ক্ষমা! কিসের ক্ষমা! আপনি অপরাজয়ে, বিজয় আপনার হবে।'

'কিন্তু সে বিজয় কি এমনই পরাজয়ে সুরু হবে?'

'পরাজয় কি? আমরা আপনার পথের কাঁটা, সরে দাঁড়ানোই ভাল।'

'না না, সে হবে না—আমি আসছি মোটর নিয়ে।'

'বৃথা—বাড়ী এলে আমাদের দেখা পাবেন না, আমরা যাব না, যেতে পারব না।'

নিশীথ অত্যন্ত রাগী মানুষ, এই কথায় সে জ্বলিয়া উঠিল, না হয় একটু অভিমান দেখাইয়াছে, তাই বলিয়া এমনই রূঢ় প্রত্যাখ্যান, সে কর্কশকণ্ঠে উত্তর দিল 'আচ্ছা নমস্কার।'

উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, খট করিয়া ফোন ছাড়িয়া দিল।

ধীরা কি বলিবে, কি করিবে ভাবিয়াই পাইল না, পুনরায় ডাকিতে তাহার সাহস হইল না।

পিতার আহ্বান তাহাকে সজাগ করিল। শিবনাথ বলিলেন 'কৈ তৈরী হওনি ত মা—ভজুয়া ত গাড়ী আনতে গেছে মা।'

ধীরা সজলকণ্ঠে বলিল 'আজ আমরা যাব না বাবা!'

শিবনাথ বলিলেন 'সে কি হয় মা। নিশীথ আসতে পারেনি বলে কি আমরা অভিমান করতে পারি?'

কন্যার ব্যথা পিতা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সে ব্যথা প্রকাশ করাও চলে না। ধীরা জানিত পিতার দুর্ব্বলতা—তাই চুপ করিয়া রহিল। শিবনাথ বলিলেন 'মা, গীতার কথাটাই মনে রাখবে, যখই আমরা বাসনা দিয়ে ইচ্ছাকে চালাই তখনই সে প্রবল হয়ে ওঠে, যে কাজ নিষ্কাম তার

কোনও গ্রন্থি নেই, কিন্তু এ দুরূহতত্ত্ব বুঝিবার মত মনের অবস্থা ধীরার ছিল না, সে চুপ করিয়া মানিয়া লইল—শুধু ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠে বলিল 'না গেলে হয় না বাবা ?'

'না, নিশীথ অন্যায় করতে পারে, আমরা পারিনে মা, তাছাড়া এটা শুধু ব্যক্তিগত কথা নয়, নিশীথ শুধু ত আমাদের পরিচিত বন্ধু নয়, সে আজ জাতির প্রতিনিধি, তাকে উৎসাহ দেওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।'

ধীরা বুঝিল, পিতার সঙ্গে তর্কে সে পারিবে না—তাই বলিল 'তবে চলুন।'

কথা ছিল ধীরাই পুরস্কার দিবে, কিন্তু ধীরা না যাওয়ায় ব্যারিষ্টার রায়ের কন্যা এষাই নেত্রীর পদ পাইয়াছে।

শিবনাথ ও ধীরা এক পাশে বসিলেন। শিবনাথ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মহোৎসাহে নিশীথের উৎসাহবর্দ্ধন করিবার জন্য জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জয়ধ্বনি করিলে কি হয়, টিন্ডেনের সঙ্গে খেলায় নিশীথকে একান্ত অপটু বলিয়াই মনে হইল।

টিন্ডেনের প্রয়োগ-কৌশল অপূর্ব্ব ও চমৎকার—দর্শকমণ্ডলী তাহাকেই উৎসাহিত করিল। পর পর দুই সেটেই সে অত্যন্ত খারাপভাবে হারিয়া গেল।

শিবনাথ তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, 'হারাটাই বড় কথা নয়, খেলাটাই বড়।'

নিশীথ নতমস্তকে এই উৎসাহবাণী গ্রহণ করিল—কোনও কথা কহিল না।

এষা বলিল 'আজ বোধ হয় আপনি আত্মস্থ ছিলেন না।'

নিশীথ ধীরার দিকে চাহিল, বলিল 'শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না।'

এষা বলিল 'চলুন আপনাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

নিশীথ আপত্তি করিল না।

শিবনাথ আপন বাসায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন ভাবিতেছিলেন, বলিলেন 'আজ রাত্রে আমাদের ওখানে—'

নিশীথ কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল 'আমায় মাফ করবেন, আজ আর যেতে পারব না।'

এই বলিয়া এষার সঙ্গে সে বাহির হইয়া গেল।

ধীরা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল, অন্যায় আসিয়াছে নিশীথের দিক হইতে, কাজেই প্রতিঘাত পাইয়া এমন অভদ্র হওয়া তাহার পক্ষে শোভন হয় নাই। পিতাকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া সে ভাবিল, যে এই পৌরুষহীন হিংসুকের সহিত কোনও সম্পর্কই সে জীবনে রাখিবে না।

শিবনাথ কন্যাকে বলিলেন 'তুমি বললে হয়ত নিশীথ আসত, ওর মনটা মুষড়ে গেছে, আজ ওর সান্ত্বনার দরকার, আজ আপন জনের কাছে তার প্রাপ্য আছে, সে প্রাপ্য না দেওয়া কি উচিত হল মা ?'

ধীরা বুঝিল পিতার বেদনা। কঠোর কথা মুখে আসিতেছিল কিন্তু সেকথা সংবরণ করিয়া বলিল 'কিন্তু উনি ত আমাদের সান্ত্বনা চান না।'

'এটা রাগের কথা হল মা, যা চাই তাকে চাইনা বলবার আড়ম্বর যখন দেখবি বেশী, তখন বুঝবি, আড়ম্বরটি ফাঁকি, চাওয়াটাই খাঁটি।'

পিতার এ দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না, সে চুপ করিয়া রহিল।

শিবনাথ বলিলেন 'এইটাই আজকাল মনস্তত্ত্বের বড় আবিষ্কার হয়েছে মা। সচেতন মন যা বলছে—তা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক হয় না, আমাদের একটি

অচেতন মন আছে মা, তার নিরুদ্ধ-ক্ষুধা কখন কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে বোঝাই যায় না।'

ধীরা বলিল 'বাবা ফ্রয়েডের কথা এখন থাক—চল বাড়ী যাই।'

'চল যাই, কিন্তু ফ্রয়েডকে ত্যাগ করা চলবে না—এটা একটা নূতন আবিষ্কার। কিন্তু যা নূতন তাই খেলো নয়। এই দর্শনের আলোকে জগতের সকল বিদ্যাকে নূতন করে গড়তে হবে।'

হঠাৎ নিরুপমের দেখা মিলিল, শিবনাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'তুমিও এসেছিলে!'

নিরুপম বলিল 'হ্যাঁ, হয়ত অবিবেচনা হয়েছে তবু আজকের এই ব্যাপারে আসা কর্ত্তব্য বলেই মনে হল।'

শিবনাথ বলিলেন 'আমিও মাকে বলেছি, এ খেলাকে খেলা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। এটা আমাদের জাতির গৌরব ও অগৌরবের কথা। বেশ, বেশ, তাহলে চল আমাদের গাড়ীতেই যাবে।'

নিরুপম ধীরার দিকে চাহিল—সেখানে কোনও সাড়া মিলিল না।

নিরুত্তর নিরুপমকে শিবনাথ বলিলেন 'না, না, কোনও ওজর আপত্তি শুনছি না, চল আমার বইটি রাত্রে পড়ব'খন।

—পাঁচ—

ফিরিবার পথে ধীরা বারবার নিশীথের কথা ভাবিতে লাগিল। এই বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক আজ যে মানসিক কষ্ট পাইয়াছে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া ধীরার নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য ছিল।

নিশীথ ভাবুক নয়, কবি নয়, দার্শনিক নয়। সে বারবার জোর গলায় বলিত 'ভারতবর্ষ চিন্তায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তার চিন্তা ফল দেয় না। সে বন্ধ্যা, তাই নূতন মানুষ গড়তে হবে যারা চলতে জানে—পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবনের পথে যারা নূতনের পরিকল্পনা করতে পারে, নূতন উদ্যানকে পুষ্পিত ও ফলবান করতে পারে, যারা শুধু চন্দন ভারবাহী গর্দ্দভ নয়—যাদের ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যারা বীর, যারা যোদ্ধা,—নিরুপমের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, এই সব পুস্তক-কীট কিছুই নয়, ইহারা কেবলই চর্চ্চিত-চর্ব্বণ করে—ইহারা স্রোতের মত খাত করিয়া নিতে জানে না। নিরুপমের মুখে কমনীয়তা আছে—ধ্যান-মৌন বুদ্ধের মত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ স্বস্তি তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিশীথের সহিত তুলনাই হয় না—নিশীথ প্রাণবন্ত ও জীবন্ত।

নিরুপমকে স্নেহ করা চলে—তাহার প্রতি মায়া হয়, কিন্তু বিকচ নারী-হৃদয়ের অর্ঘ্য—সে বীরের পূজার জন্য। তাই ধীরা সংকল্প করিল, নিরুপমকে সে কিছুতেই আমল দিবে না। নিশীথের অভিমান যতই তাহার মনকে নাড়াইতেছিল, ততই সে নিশীথের আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল।

রাস্তায় কথা হইল না—নিরুপম সম্মুখে বসিয়াছিল, শিবনাথ কথা বলিতে ইচ্ছুক থাকিলেও অবসর পাইলেন না।

সেদিন ছিল চাঁদিনী রাত—বারান্দায় টবে বেল ও রজনীগন্ধা ফুটিয়াছে, কৃষ্ণচূড়ার পাতায় কনক চাঁদের আলো আসিয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে, সোফায় বসিয়া শিবনাথ পড়িতে লাগিলেন।

নিরুপম উৎসুক শ্রোতার মত শুনিতে লাগিল। একস্থানে শিবনাথ লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের নিষ্কাম ধর্ম্ম অতুলনীয়, অপূর্ব্ব ঐশ দান। পৃথিবীর আর কোনও জাতি এই মহৎ কল্পনার ধারণাও করিতে পারে না।

আমরা যদি বাঁচিতে চাই তবে আমাদের এই সনাতন আদর্শে ফিরিতে হইবে।"

ধীরা বলিল 'বাবা, গঙ্গা কি হিমালয়ে ফিরিতে পারে? বলবে পারে না— এও তেমনই ভারতবর্ষ ফিরবে না, ফিরতে পারে না, তার অতীতে, তার সম্মুখে আছে মহৎ ভবিষ্যৎ—সেই সাধনাই তাকে করতে হবে, অতীতের পূজা নয়।'

নিরুপম বিস্ময়ে তরুণীর মুখের দিকে চাহিল—চাঁদের আলো ও তড়িৎ-আলোয় মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। রহস্যময়ী দেবীর মত মহিমা তাহার ভাস্বর মুখে—বিচিত্র-ভাষাসম্পদ তাহার কণ্ঠে, তীক্ষ্ণ শাণিত বুদ্ধি তাহার জয়-পতাকা—নিরুপম মুগ্ধ বিস্ময়ে ধীরাকে দেখিতে লাগিল।

শিবনাথ বলিলেন 'মা সমস্ত জিনিষই পূত; অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গাঁথা—অতীতকে ছাড়লে আমরা দাঁড়াতে পারব না, সে হবে বালু-সৌধ।'

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল—নিশীথ সবেগে প্রবেশ করিয়া শিবনাথবাবুর পায়ের ধূলি মাথায় নিয়া বলিল 'আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার আদেশ না মানা আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

ধীরার মুখে পুলকের বন্যা বহিল, সে ডাকিল 'ভজুয়া একটা সোফা দিয়ে যা।'

ধীরা নিজের সোফায় নিশীথকে বসিতে দিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিশীথ বসিল না।

ধীরা উঠিয়া দাঁড়াইতেও নিরুপম বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া এবং তাহার উপস্থিতিকে অপছন্দ করিয়া সে চাপাসুরে বলিল 'ব্রুট।'

কথাটি নিরুপমের কানে গেল, সে ভাবিয়া পাইল না, এই অহেতুক ক্রোধের কারণ কি! সোফা আসিল—নিশীথ বসিয়া বলিল 'আমার মন ভাল ছিল না—তাই এমন হার হয়েছে।'

শিবনাথবাবু গম্ভীরমুখে বলিলেন 'চাঞ্চল্য ক্ষতিকর, মনঃসংযমের অভাব হলে কোন কাজেই সিদ্ধি হয় না।'

নিরুপম বুঝিল, এ সম্মিলনে তাহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবনাথকে বলিল 'আমি এখন উঠি।'

শিবনাথ নিরুপমকে আগাইতে গেলেন।

নিশীথ বলিল 'এমন একজন অসভ্যকে বাড়ীতে আসতে দাও কেন?'

ধীরা সুস্পষ্ট বীতরাগে প্রীত হইল না—ধীরে ধীরে বলিল 'বাবা ওঁকে স্নেহ করেন, উনি পণ্ডিত, তবে ভদ্রসমাজে কখনও মেশেননি—তাছাড়া বড় গরীব।'

'সংসারটা গরীবের জন্য নয়—আর তাছাড়া দারিদ্র্য একটা পাপ সেকথা ভোলা চলে না।'

পিতৃধনে গর্ব্বিত নিশীথকে অনেক উত্তর দেওয়া চলিত, কিন্তু আজকের দিনের মান-অভিমানের পরে ধীরা নিশীথকে আঘাত দিতে চাহিল না, কেবল প্রশ্ন করিল 'এষা এত শীঘ্র ছেড়ে দিল যে?'

নিশীথ বলিল 'এষা জানে, আমার মন কোথায়।'

ধীরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, যাহা বাঞ্ছিত তাহা যখন গোপন, তখন সে লোভনীয়, প্রকাশের ঔজ্জ্বল্যে তাহা ম্লান হইয়া ওঠে।

নিশীথ নিরুত্তর ধীরাকে প্রশ্ন করিবার জন্য বলিল 'আমি ক্ষমা চাইছি, আমায় ক্ষমা করবে ত?'

'জানি না, কিন্তু দাসী হওয়া সাজবে না আমার, তুমি মুখে যতই স্বাধীনতার বড়াই কর না কেন, তোমার মনও চায় অপ্রতিহত আধিপত্য।'

কথা শেষ হইতে পারিল না, শিবনাথ আসিয়া পড়িলেন

—ছয়—

গ্রীষ্মের ছুটিতে শিবনাথ পুরী আসিলেন। সমুদ্রের বেলাভূমে প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমুদ্রের চিরন্তন রূপ দেখিতে ধীরা আসিত। দেখিয়া চোখ মেটে না। সমুদ্রের ক্রুদ্ধ আর্ত্তনাদে যেন বিরহীর বেদনা স্ফূর্ত্ত হইয়া ওঠে।

ধীরা ভাবে, নিশীথ যদি আসিত, ভালই হইত।

শিবনাথ পুরীতে আসিয়া একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, প্রতিদিন সেখানেই যান।

পরিব্রাজকের কথা শিবনাথের অন্তরে সাড়া দিত, 'শুষ্ক তর্ক আমাদের জীবনের পাথেয় নয়, রসই অবলম্বন, কারণ তিনি যে রসময়—'

বৈদান্তিক শিবনাথ বৈষ্ণব ভাব সাধনার কথা কখনও অনুভব করেন নাই, কখনও বুঝিতে চান নাই।

পরিব্রাজক পদামৃত গাহিতেন আর নয়নজলে ভাসিতেন—

'পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর মাঝে

প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে।
ভ্রমরা জানয়ে কমল-মাধুরী,
তেঁহল তাহার বশ,
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ ॥
সই একথা বুঝিবে কে ?
যেজন জানয়ে সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে
ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে,
চণ্ডিদাসে কহে, শুন লো সুন্দরি !
পিরীতি রসের সার,
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার।

প্রৌঢ় বিবিক্ত সন্ন্যাসী এই প্রেমের গানে কি আনন্দ পান শিবনাথ তাহা বুঝিতে পারেন না। বলেন—'কিন্তু এই সাধনাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ হয়েছে—গোপীভাব আমাদের দুর্ব্বল করেছে, বীর্য্য ও শক্তির মন্ত্র আমরা ভুলেছি। আমরা হয়েছি রমণী—'

পরিব্রাজক হাসেন, মৃদু সে হাসি, ব্যঙ্গ নয়, আনন্দ-উৎফুল্লতায় সে বিকশিত। বলেন 'পুতুল খেলা যখন তখন বালিকা মনে করে, জীবনের

বিনিময়ে সে পুতুল ছাড়তে পারবে না, কিন্তু তবু পুতুল ছাড়তে হয় বাবা !'

'কিন্তু এত আপনার উত্তর নয়, আপনি কেবল তর্ককে এড়িয়ে গেলেন।'

উত্তর হয়, "বৈষ্ণবেরা বলেন বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

'কিন্তু এ ত তর্কের বিষয় নয়। সন্দেশ সুস্বাদু কিনা তা নিয়ে যুগযুগান্তর তর্ক চলুক, মীমাংসা হবে না। জিভের সাথে তার যোগ করে দিলে সকল সমস্যা শেষ হয়ে যাবে।'

শিবনাথ তর্ক ছাড়েন না, বলেন 'এ উপমাও আপনার নিষ্ফল, য়ুরোপীয়দের জিভে সন্দেশ তার সুধা-তার বর্ষণ করে না।'

পরিব্রাজক হাসিলেন, বলিলেন 'বাবা ! আপনার তর্ক বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয়, রসে মন ভরে, যার ভরেছে সেই বোঝে, যে পায়নি সে বোঝে না।'

শিবনাথের মনে ব্যাকুলতা জাগে। বলেন 'কিন্তু পাই কি করে ?'

সন্ন্যাসী ললাটে অঙ্গুলি ঠেকাইয়া বলিলেন 'রাধারাণীর কৃপা !'

শিবনাথ বলেন 'আমি অকিঞ্চন—আপনি আমায় পথ দেখান।'

'সময় হয়নি বাবা, সাধুসঙ্গ করুন, মনে কৃষ্ণকথায় রতি আসুক।'

সেই হইতে রাধারাণীর কৃপার জন্য শিবনাথ বৈষ্ণব-সমাগম করিতেছেন, প্রতিদিন আখড়াতে যান, চরিতামৃতের পাঠ শোনেন, ভাবানুভবের চেষ্টা করেন।

ধীরা তাই একাকীই ফেরে।

সমুদ্রতীরে নর ও নারীর এই স্বাধীন স্বেচ্ছা-ভ্রমণ ধীরার ভাল লাগে। উপরে অবাধ আকাশ ও পাশে অবাধ সমুদ্র, বেলাভূমে মানুষ যদি আড়ষ্টতা আনে তবে অত্যন্ত অন্যায় হবে। সেদিন অন্য মনে সে অনেক দূর গিয়া

পড়িয়াছিল। এদিকটা জনবিরল। তাহার চোখে পড়িল একটি তরুণ ও একটি তরুণী বালুতীরে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

কৌতূহল জাগিল, মানুষের চিরন্তন কৌতূহল। ধীরা চলিতে চলিতে কান খাড়া করিয়া রহিল।

যুবকটী বলিতেছিল 'এষা তুমি অত্যন্ত সুন্দর—'

নামটি কানে আসিতেই ধীরা চলিতে পারিল না, পার্ব্বতীর মত তাহারও অবস্থা হইল, ন যযৌ ন তস্থৌ।

এষা উত্তর দিল 'এ শুধু আপনার চাটুকারিতা।'

নিশীথ বলিল 'না এষা, তোমায় আমি একান্তই ভালবাসি।'

ধীরার শাড়ীর খস্‌খস্ শব্দ এষার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এষার দৃষ্টির সহিত নিশীথেরও চোখ পড়িল।

এষা বলিল 'ধীরাদি, কোথায় আছ তোমরা ?'

ধীরা চলিতে চলিতে কি উত্তর দিল বাতাসে শোনা গেল না, নিশীথের কর্ণমূল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে ধীরাকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কণ্ঠে আকস্মিক জড়তা নামিল।

ধীরার মনে হইতে লাগিল, বসুন্ধরা টলিতেছে, সমুদ্রের উত্তাল আলোড়নে সে আর নিজকে সামলাইতে পারিতেছে না, এই আলোড়নে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে দোলা দিতেছে—দৃষ্টির বাহিরে গিয়া সে বালু-বেলায় বসিয়া পড়িল।

এষাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া দিয়াই নিশীথের অনুতাপ জাগিল। সে তখনই খুঁজিয়া শিবনাথের সন্ধান করিল। পুরী আসিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, এষার আমন্ত্রণে সে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। শিবনাথের সহিত দেখা হইতেই সে বলিয়া বসিল 'আমি শীঘ্রই বিলেত যাব।'

এ প্রস্তাব যেমনই আকস্মিক তেমনই অসংলগ্ন। শিবনাথ বিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে তাকাইলেন।

নিশীথ বলিয়া চলিল 'জার্ম্মেনিতে অলিম্পিক খেলা হবে, আমি তাতে যোগ দেব ঠিক করেছি। তারপর য়ুরোপের সমস্ত ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানগুলি ভাল করে দেখে-শুনে আসব।'

'এ ত ভাল কথাই, তুমি দেশের নাম রাখতে পারবে এ ভরসা আমি করি।'

'কিন্তু যাওয়ার আগে—'

নিশীথের কথা অর্দ্ধ অসমাপ্ত রহিয়া গেল। শিবনাথ বুঝিলেন, বলিলেন 'সে ত আনন্দের কথা—তা তুমি ত কয়েকদিন আছ, একদিন আসবে, আমি মায়ের মতটি নিই।'

নিশীথের মনে হইল, তখনই ব্যাপারের হেস্ত-নেস্ত করিয়া ফেলে, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ বাধা দিল।

সে যেমন আকস্মিক আসিয়াছিল তেমনই আকস্মিক বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ খুঁজিলেন, ধীরা তখনও ফেরে নাই।

ধীরা যখন ফিরিল, তখন তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া শিবনাথ বলিলেন 'কি হয়েছে মা?'

'কিছুই না, এমনই শরীরটা ভাল লাগছিল না।' এই বলিয়া পিতার সতর্ক-দৃষ্টি এড়াইয়া আপন ঘরে গিয়া সে কাঁদিতে বসিল।

আহারের সময় যখন সে ফিরিল, তখন বর্ষণশ্রান্ত আকাশের মত তার মুখে দীপ্তি ফিরিয়াছে।

শিবনাথ মাছের ঝোল খাইতে খাইতে বলিলেন 'আমি নূতন একটা সঙ্কল্প করেছি ধীরা!'

'কি বাবা ?'

কথাটি বাধ-বাধ লাগে, তিনি ভাত নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিলেন 'আমি বৈষ্ণব দীক্ষা নেব ভাবছি, মাছ মাংস আর খাব না।'

'তা হয় না বাবা !'

'কেন রে পাগলি !'

'চির-জীবনের অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে অসুখ হবে তোমার।'

শিবনাথের মুখে হাসি ফুটিল 'এমন করে ছোট্ট খোকার মতন শাসন করে কি চিরকাল রাখতে পারবি মা ! পরের ঘরে যাওয়ার দিন ত এগিয়ে এসেছে, হাঁ ভাল কথা, আজ একটু আগে নিশীথ এসেছিল।'

ধীরা বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল 'এই একটু আগে ? সে বিলাত যাবে।'

শিবনাথ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কোনও উদ্বেগ বা আতঙ্ক দেখিলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন 'সে বিয়ের জন্য উতলা হয়েছে—'

ধীরার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মানুষের বর্ব্বরতার একটা সীমা আছে—এইমাত্র যে অপর একটি তরুণীকে প্রণয় নিবেদন করিয়া আসিয়াছে, তাহার এই ধৃষ্টতায় সে অত্যন্ত রুষ্ট হইল, সে বলিল 'তার বিয়ের জন্য মেয়ের অভাব নেই, ব্যারিষ্টার রায়ের মেয়ে এষাকেই সে বিয়ে করবে।'

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িলেন, তাহার দর্শনে এইরূপ তর্কের সন্ধান মেলে না। নিশীথের প্রশ্নের ইঙ্গিতের যে অন্য অর্থ হয় তিনি কিছুতেই তাহা ভাবিতে পারেন না। এদিকে কন্যার এই উপেক্ষা—শিবনাথ কি বলিবেন বুঝিয়া পাইলেন না।

ধীরা কথাকে প্রসঙ্গান্তরে নিবার জন্য বলিল 'বাবা ! তোমার এই পরিব্রাজকের কাছে আমায় একদিন নিয়ে যাবে ?'

শিবনাথ জানিতেন, কন্যা নব্যা—গুরুবাদ, ভক্তিবাদে তাহার অত্যন্ত আপত্তি। কাজেই অনুমান করিলেন, ইহা প্রণয়-কলহ, কাল ইহার মীমাংসা করিবে। তাই বলিলেন 'যাবে মা! স্বামীজী অত্যন্ত চমৎকার মানুষ!'

ধীরার দিকে সাড়া পাওয়া গেল না। কথা আর জমিল না।

পরদিন বালু-বেলায় এষা ও ধীরার দেখা মিলিল। ধীরার মনে ঈর্ষ্যার জ্বালা ছিল—এষা মনে ও প্রাণে আধুনিকা। নিশীথের খেলাকে সে খেলা হিসাবে দেখিয়াছে—তাহার জন্য ধীরা পীড়া পাইয়াছে বলিয়া সে ধীরাকে সান্ত্বনা দিতে চাহে।

এবার সুন্দর সাবলীল নমস্কারকে রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ফিরাইয়া দেওয়া ধীরার পক্ষে সম্ভবপর হইল না, সে বলিল 'কই নিশীথবাবু কই?'

এষা বলিল 'তিনি ত আজ চলে গেছেন, আমাদের এখানে আর ফিরবেন না বলেছিলেন—আমি ভাবছি তিনি আপনাদের ওখানেই গেছেন।'

ধীরা কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল 'তার মানে?'

'মানে কিছু নয় দিদি, আপনাদের সঙ্গে বহুকালের জানাশুনা।'

ধীরা বলিল 'এ অত্যন্ত অন্যায় তার, আপনাকে বিরহিণী রেখে যাওয়ার অর্থ কি?'

এষা হাসিল 'পুরুষদের বাচালতায় আমরা বিশ্বাস করিনে দিদি, কাল যা শুনেছ, সেটি একটি সন্ধ্যার ভাবো[illegible] মাত্র, তার পিছনে সত্য নেই—একথা সবার চেয়ে আমিই অধিক জানি।'

'কেমন করে?'

'কারণ জানি তার ভালবাসা কোথায় আপন আশ্রয় পেয়েছে। তাইত ভাবছি, বেচারী এখন কোথায় গেলেন। আপনার উপেক্ষায় তিনি কি করে বসেন ভেবেই পাই না।'

'মানে ?'

'এতদিন ধরে পরিচয় আর এইটিই জানেন না—নিশীথবাবু অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল, ভাবের বেগে কখন কি করে বসেন কে জানে !'

ধীরা একথা এমন করিয়া কখনও ভাবে নাই। তাহার অন্তর সদয় হইল, সে বলিল 'আমায় ক্ষমা কর বোন—কিন্তু আমি প্রার্থনা করি তোমাদের জীবন সুখী হোক।'

এষা কৌতূহলভরে বলিল 'একি ত্যাগ ?'

ধীরা উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল 'উপহাস করবার মত পরিচয় আমার নেই।'

'তবে ?'

'নিশীথবাবু, আমার বন্ধু, তিনি যাকে ভালবাসেন, তাকে বিয়ে করে সুখী হন, এ কামনা বোধ হয় অন্যায় নয়—'

এষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল 'কিন্তু আমিও ঐ কামনা যদি করি, তাহলে তুমিও আমায় অপরাধী করবে না।'

ধীরা বলিল 'তুমি ভুল বুঝেছ বোন, বন্ধুত্ব আর প্রেম এক নয়।'

এষা বক্তার মুখের দিকে চাহিল। কথাগুলি আন্তরিক কি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল। সে কৌশল করিয়া প্রশ্ন করিল 'কিন্তু তোমার বিরাগের কারণ কি ?'

'বিরাগ কে বললে, কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না, আমি রাগ করে বলছি না।'

এষা হাসিয়া উত্তর দিল, 'না, কিন্তু তোমার বিরাগ থাকলেও আর একজনের অনুরাগ থাকতে পারে, একজনের মুখের কথা তার প্রাণের কথা নয়, একথা ভুল না দিদি !'

ধীরা উত্তর দিল না, থামিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের দিকে চাহিল। একথা এমন ভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। খানিক পরে সহসা সে বলিল 'যাই বোন, বাবার সাথে এক যায়গায় যেতে হবে।'

ধীরা চলিয়া গেল। এষা তাহার মনের দ্বন্দ্ব বুঝিতে পারিল। সমর্পণ-ব্যাকুল চিত্ত অভিমানে সমুদ্রের মত ক্ষোভে শ্বসিতেছে। এই বীতরাগ চিরস্থায়ী নহে। এষা সংসারকে চেনে, তাই এই লীলাবিলাসকে সে কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল।

—আট—

সংসারে যাহা কামনা করি তাহা পাই না। ধীরার মন যখন নিশীথের জন্য পুনরায় ব্যাকুল হইল, তখন ভবিতব্য অন্য খেলা খেলিলেন।

পরিব্রাজক ধীরাকে বলিলেন, 'মা, জাতির একটি বিশিষ্ট রূপ থাকে, সেটি বাঁচিয়ে রাখার বড় দাম আছে।'

ধীরা তর্ক করিতে যাইতেছিল। সে এসকল মানে না, হিন্দুত্বের পরিপোষক এমন বক্তৃতা সে বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু তাহা তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। হিন্দুত্ব পঙ্গু, কারণ চলাই তার সাক্ষ্য, জগৎ চলিতেছে, হিন্দুত্ব চলিতেছে না, এমনই নানা কথা তাহার মনে জাগিতেছিল।

কিন্তু পরিব্রাজকের মুখে এমনই একটা প্রশান্তি রয়েছে, তার ভাষায় এমনই একটি বিশ্বাস-দৃপ্ত মোহিনী মায়া আছে যে তাহার সঙ্গে তর্ক করা চলে না।

শিবনাথ বলিলেন, 'আমিও তাই অনুভব করছি স্বামিজী, এতদিন ধরে যাকে বাঁচানো গেছে, তাকে নষ্ট করা ঠিক নয়, তাই নিরুপমের সঙ্গে ধীরা-মায়ের মিলন করে দিয়েই আমি প্রব্রজ্য গ্রহণ করব।'

ধীরার কান্না আসিতেছিল, যাহাকে সে কখনও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করে নাই, তাহারই কাছে এমন ভাবে সমর্পিত হওয়ার দুর্ভাগ্য সে কিছুতেই বরণ করিবে না। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সে আপন কথা কিছুতেই বলিতে পারিল না।

পরিব্রাজক বলিলেন, 'মা, তোমার মন হয়ত সায় দেয় না, কিন্তু আমাদের এই চলাটাই পিতৃপিতামহের পথের অনুসরণ, সেই পথই আমাদের গ্রহণীয়।'

ধীরা বলিল, 'আমি একে মানিনে, হিন্দুত্বের শিক্ষাকেই চরম মনে করিনে, পৃথিবীর মানুষের সাথে যোগ না রাখলে আমরা বঞ্চিত হবো।'

'এটি তোমার শেখা বুলি মা, য়ুরোপ কাঁদছে, ওরা কেবলই ভাঙ্গছে, তাইত ওদের শাশ্বত আশ্রয় নেই, কিন্তু এ আমাদের সনাতন প্রতিষ্ঠা, জল, ঝড় অনেক গেছে, তবু ভাঙ্গেনি।

অকাট্য যুক্তি, কাজেই ধীরা অবলম্বন পায় না, বিদ্রোহের পথে যাহাকে সে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিত, সেই নিশীথ কোথায় উধাও হইয়াছে কোনও খবরই পাওয়া গেল না।

শিবনাথের টেলিগ্রামে নিরুপম আসিল, গুরুতর আদেশ সে নতশিরে বহন করিতে সম্মত হইল।

ধীরা তাহাকে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, 'আমি যদি আপনাকে শ্রদ্ধা না করিতে পারি, আমায় ক্ষমা করবেন।'

নিরুপম হাসিল, স্নিগ্ধ-মধুর হাসি, বলিল, 'আমাদের বিয়ে নভেল নয় ধীরা, সেটা চিরন্তন বন্ধন—জন্মজন্মান্তরের ডোর।'

'আমি এ সংস্কারে মানুষ হইনি।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, সংসারে কিছুই হারায় না, যাকে দেখছি না সে অদৃশ্য, কিন্তু বিনষ্ট নয়, মরুভূমে নদী পথ হারায়, কিন্তু অন্তঃস্রোতা জলধারা একস্থানে মরুদ্যান গড়ে। তুমি হারাওনি, হারাতে পার না জাতির সংস্কার।'

এই সব বিশ্বাসী মানুষদের মনে সন্দেহের অবসর নাই। আশ্বস্ত-হৃদয় এই সব মানুষকে লইয়া কারবার করা ধীরার পক্ষে দুঃসহ।

সে বলিল, 'আমি আর একজনকে ভালবেসেছিলাম।

'জানি, সেটা ভালবাসা নয়, ওটা মোহ, আমাদের বিয়েতে মোহের স্থান নেই, একে আমরা মনে করি সংস্কার, এ শুধু জীবনের অনুশীলনের পন্থা।'

ধীরা রাগিল, বলিল, 'আপনি কেবল বই পড়ছেন, আপনাকে বোঝানই দায়।'

এইটাই সত্য কথা। সংসারের সহিত নিরুপমের পরিচয় অল্প। কাব্যের পাতায় ছাড়া সে নারীকে নারী হিসাবে জানিবার সুযোগ পায় নাই।

গ্রন্থকীট সে, ধীরার মানসদ্বন্দ্ব বুঝিতে পারে না। সে শুধু বলে, 'আমি অযোগ্য।'

এমন গোবেচারী লোককে লইয়া তরুণীর তর্ক চলে না। সে হাল ছাড়িয়া দেয়, আর্ত্তকণ্ঠে বলে, 'আপনি যোগ্য কিন্তু আমার মনে হয় আমি আপনার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হব না।'

হয়ত রূপের মোহ নিরুপমকে ভুলাইয়াছিল, সে এবার আলোক দেখিল, 'এই তোমার আপত্তি, এটা কিছুই নয়, হিন্দুনারীকে কিছুই শিখাতে হবে না, তোমাদের রক্তে ও নাড়ীতে রয়েছে যুগযুগান্তরের সাধনা।'

ধীরা রাগিয়া উঠে, বলে, 'এটা, ডিবেটিং ক্লাব নয়।'

নিরুপম অবাক হইয়া তরুণীর ক্রোধারক্ত মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহে।

কিন্তু তর্ক নিষ্ফল রহিল, পরিব্রাজকের কথায় শিবনাথবাবু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এখানে কন্যার স্বতন্ত্র হইবার প্রয়োজন নাই। শুভদিনে শুভলগ্নে পুরীর সমুদ্র-তটে দু'টি হৃদয় মিলিল, ভাবোদ্বেল তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে দু'জনের হৃদয় ভরপূর, কিন্তু ধীরার মনের অশ্রান্ত ক্রন্দন তাহাকে জানাইল হয়ত সে কোনও বেদনা ভোলে নাই, হয়ত সে হৃদয়-বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। সদাশিব আত্মভোলা নিরুপমকে ফাঁকি দিতে ধীরার মনে বেদনা জাগিতেছিল, কিন্তু যে বোঝে না তাহাকে বুঝানো চলে না। কাজেই নিরুপমের জাগ্রত প্রেমের বন্যা যখন কূলপ্লাবন করিতে চাহে, তখন তাহাকে পরিতৃপ্তির ভাণ করিতে হয়।

পরিব্রাজক বলিবেন, 'ভবিতব্যতা' সাধারণে বলিবেন নিয়তি, কিন্তু ফল একই। ধীরা ও নিরুপম চিরন্তন বন্ধনে বন্দী হইল।

—নয়—

বিবাহ হইল কিন্তু ধীরা সংকল্প করিল সে মানিবে না। হৃদয় যেখানে মেলেনি সেখানে সে বিরূপ হইয়া রহিবে। নিরুপম পিতৃমাতৃহীন, গ্রামের সংসারে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় পিসী ছিল। পিসীমা নববধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। যে বধূকে তিনি শাসন করিতে পারেন, যাহাকে লালন-পালন করিতে পারেন, এ বধূ সে নয়, একদিনের আলাপেই পিসীমা তাহা

বুঝিলেন। কাজেই সংসারে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি আপন কর্তৃত্বকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন না। একান্ত সহজ উদাসীনতায় তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রাচীন সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এখানে চলিবে না, পিসীমা তাহা বুঝিলেন। কিন্তু স্বামীকে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে পাইলেও ধীরা তাহাকে প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

সেদিন রাত্রে স্বামীর শয্যায় সে নিরুপমের আগ্রহব্যাকুল আলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়া কহিল, 'তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমায় ভালবাসতে পারব না।'

নিরুপম সংযত হইয়া বলিল, 'ভালবাসা নভেলিয়ানা, ওটার অভাব কিছু নয়!'

ধীরা উচ্ছসিত হইয়া কহিল, 'তোমার কথা বুঝতে পারি না—'

নিরুপম যেন বক্তৃতা করিতে বসিল। ধীরা শিয়রের জানালা খুলিয়া দিল। একটী বনফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

নিরুপম বলিয়া চলিল, 'মানুষের মধ্যে একটা অতলস্পর্শ মহিমা আছে, সেখানেই নরনারীর সম্মিলন, ভালবাসা ন্যাকামি। মানুষ চায় সেই অদৃশ্যের সঙ্গ, যা তার অনুভূতিতে ধরা পড়ে না, তাইত নর ও নারীর এই অধীর ব্যাকুলতা। বৃহদারণ্যকে এই কথাই বলেছেন।'

ধীরা বলিল, 'তোমার বৃহদারণ্যক থাক, আমি বুঝতে পারব না।'

'বুঝতে পারবে না, খুব পারবে। তুমি ও আমি কেবল প্রত্যক্ষই নই, আমাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটী অপ্রত্যক্ষ ভূমা, এক অপরিমিত নৈর্ব্যক্তিক অসীমতা তাকেই বলতে পারো আত্মা। আত্মার সেই দুর্দ্দম ক্ষুধাকে যখন আমরা কলুষিত করি তখনই বলি ভালবাসা।'

ধীরা বুঝিল না, বলিল, 'তোমার এই দার্শনিকতায় আমার মন ভরবে না !'

নিরুপম রাগ করিল না। ধীরে ধীরে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'আমি জানি, তুমি চঞ্চল হয়ে আছ। এ চঞ্চলতা তোমার থাকবে না, তুমি একদিন আপন স্বকীয়তাকে মর্য্যাদা দেবে, সেদিনের জন্য আমি অপেক্ষা করে রইব।'

নিরুপম পাশ ফিরিয়া শুইল এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরার চোখে ঘুম আসিল না। জানালার ফাঁকে খানিক আকাশ দেখা যায়। মশারির মধ্য দিয়া সেই সুদূর আকাশের দিকে চায়। এই সমস্ত অর্থহীন বুলি তাহাকে মুগ্ধ করে না। সে নিশীথের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে।

নিশীথকে সে লিখিয়াছে সে বন্দিনী সীতা। রামচন্দ্রের মত সে যেন তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিয়া যায়। নিরুপমের সহিত বিবাহ হইয়াছে একথা সত্য, কিন্তু সে যে নিশীথের বাগ্‌দত্তা বধূ। নিশীথ যেন জোর করিয়া সেই বধূকে গ্রহণ করে।

কয়েকদিন পরে পত্রোত্তর আসিল। নিশীথ লিখিছে সে বিলাত চলিয়াছে। ধীরা যেন তাহার স্বামীকেই ভক্তি করে। ধীরা জীবনে সুখী হোক এই কামনাই সে করে।

ধীরা যেন আকাশ হইতে পড়িল। ধীরা শিক্ষিতা, নিশীথকে এইরূপ আহ্বান করা তাহার অন্যায় তাহা সে জানিত। নিশীথের উত্তরও অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তবুও যেন কোনখানে তাহার হৃদয়ে কাঁটার খোঁচা বিঁধিতেছিল।

ইহার পর হইতে গতি ফিরিতে আরম্ভ করিল। সে নিরুপমকে যত্ন করিতে আরম্ভ করিল।
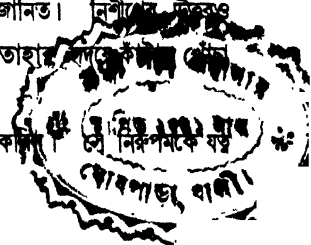
নিরুপম অন্য একদিন বলিয়াছিল, 'তোমার রূপ ত বড় কথা নয়, তোমার গুণও বড় কথা নয়, আমি চাই তোমার গভীরতম আত্মাকে, যার দর্শন তুমি পাওনি—'

এই কথার উত্তরে সে বলিয়াছিল, 'এ তোমার ভণ্ডামি।' ভালবাসাকে দৈহিক আকর্ষণের উপর সে দেখিতে শেখে নাই। নারী যেখানে নারী নয়, যেখানে সে কেবল অস্তিত্ব, সেখানে প্রেম অসম্ভব, ইহাই তাহার ধারণা।

পিসীমার সঙ্গ তাহার মতি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিল। পিসীমা বলিতে-ছিলেন, 'উনি খুব রাগী মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাহলে কি হয় রোজ ভোরে উঠে পাদোদক না পান করে আমার তৃপ্তি হত না।'

ধীরা সোয়েটার বুনিতেছিল। হাতের কাঁটা নামাইয়া বলিল, 'কিন্তু এতে কি লাভ হত পিসীমা?'

'তা ত জানি না বৌমা, তবে এটাকে আমরা ব্রত মনে করতাম।'

'তোমাদের কি ভালবাসা হয়েছিল পিসীমা?'

বুড়ীর লোলচর্ম্মে যৌবনের মসৃণতা ক্ষণিকের জন্য জাগে। পিসীমা বলেন, 'তখনকার দিনে ভালবাসা কি তা ত আমরা জানতাম না। আমরা জানতাম সোয়ামি দেবতা, তাই পূজা করতাম।'

'কিন্তু তাতে সার্থকতা কি হল? তোমার ব্যক্তিত্বের কি পরিস্ফুরণ হল?'

পিসীমা বুঝিলেন না। উদ্বিগ্নচিত্তে বধূর মুখের দিকে চাহিলেন।

ধীরা আপন বোকামি বুঝিয়া বলিল, 'এই পূজায় তোমার নিজের কি লাভ হয়েছে পিসীমা?'

'লাভ? লাভের কথা ত এ নয়। সোয়ামি গুরু, তার পূজা করেছি, এই ত আমার ভাগ্য।'

ধীরা বুঝিল, পিসীমাকে আজকালকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্ম্ম অনুধাবন করাইবার চেষ্টা নিষ্ফল। সে চুপ করিল।

কিন্তু একদিক হইতে নয়, চারিদিক হইতে এমন ভাব আসিতে লাগিল। পিতা তাহাকে জানাইয়াছেন, পতিকে অব্যভিচারিনী ভক্তি নারী জীবনের চরম লক্ষ্য, সে পতিকুলে গৃহশ্রী হইয়াছে জানিলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। পিতার গুরুদেবও এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছেন।

কিন্তু লেখাতে হয়ত যাহা ঘটিত না, তাহা ঘটিল নিরুপমের ব্যক্তিত্বে। এই যে মানুষটী তাহার সমস্ত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে সে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সেবায় সে মন দিল।

তাহার সুখ সুবিধার দিকে নজর দিল। নিরুপমের দিক হইতে আর উচ্ছ্বাস আসে না। তথাপি সে যেন গভীর আকর্ষণ অনুভব করে।

এই আকর্ষণ দিনে দিনে গভীরতর হয়। অস্ফুট স্ফুটতর হয়। ফাল্গুনে বিবাহ হইয়াছিল। পরের ফাল্গুনে সে আত্মদম্ভ বিসর্জ্জন দিয়া নিরুপমকে বলিল, 'তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

নিরুপম কথা বলিল না। চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া পত্নীকে পাশে টানিয়া লইল।

'তুমি তাহলে ভালবাসতে শিখেছ ?'

ধীরা তাহার আয়ত চোখদুটি নত করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, 'হয়ত না, তবু কর্ত্তব্য করবার চেষ্টা করছি ?'

নিরুপমের দার্শনিক মনও এই উত্তরে ব্যথিত হইল। সে বলিল, 'বেশ, কর্ত্তব্যের প্রেরণা তোমাকে সত্যের পথ দেখাক।'

সেই সন্ধির উচ্ছ্বাসেই বনজ্যোৎস্নার রোপণোৎসব সম্পন্ন হইল। মনে হইল সমস্ত মেঘ কাটিল। কিন্তু মানুষের আশা অনেক সময় সিদ্ধির তীরে আসিয়াও ডুবে। হয়ত নিয়তির নির্ব্বন্ধ ইহাই।

পরদিন খবর আসিল, শিবনাথবাবু অসুস্থ। ধীরা পিতার সেবার জন্য কলিকাতা চলিল। নিরুপম সদ্য চাকুরি পাইয়াছে, ছুটি নিতে পারিল না। সে পিছনে যাইব বলিয়া ধীরাকে পাঠাইয়া দিল।

ধীরা তাহার নবজাগ্রত প্রেমের দুঃখ অনুভব করিল না। বহুবর্ষ মাতৃহারা কন্যা শিবনাথের স্নেহে লালিত হইয়াছে, তাই পিতার অসুখের সংবাদ তাহাকে অন্য সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শোকাতুরা জননীর মত ব্যাকুলা করিয়া তুলিল।

পিসীমা বলিলেন, 'একা যাবে বৌমা !'

'তা যেতে পারব, আর তাছাড়া উপায়ই বা কি ?' এই বলিয়া তাহার দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সে ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

পিসীমা বলিলেন, 'কেঁদ না মা, বাবা ভাল হয়ে যাবেন, ভালয় ভালয় তাড়াতাড়ি ফিরে এস মা।'

ছোট গ্রামের মাঠের মাঝে একটী ছোট ষ্টেসন। নিরুপম ওয়েটিং রুমে বসিয়া বলিল, 'রোজ চিঠি দিও ধীরা।'

'দেব।'

'ভুলবে না ত ? আমরা খুব ব্যস্ত থাকব, আর পৌঁছেই একটা টেলিগ্রাম করে দেবে।'

'দেব।'

সংক্ষিপ্ত সহজ উত্তর ! নিরুপম চাহিতেছিল বিয়োগব্যথায় ধীরা উচ্ছ্বসিত

ক্রন্দনে বুক ভাসাইবে। ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছে না, কিন্তু না গেলে নয় তাই যাইতেছি এই বলিয়া দুঃখ করিবে।

ধীরা সে সব কিছুই করিল না।

স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য গৃহিণীর মত সে কোনও বাক্যাড়ম্বর করিল না।

গাড়ী আসিল। ধীরাকে উঠাইয়া দিয়া নিরুপম বলিল, 'সাবধানে যেও, আমি আসি।'

ধীরা কথা কহিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। নিরুপম দুঃখ অনুভব করিল। প্রথম বিদায়, তবু নাটকীয় কিছু ঘটিল না ইহাই তাহার বেদনা।

—দশ—

ধীরা পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল।

শিবনাথ চোখ মেলিয়া দেখিলেন। আনন্দ প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, 'এসেছিস মা!'

'এসেছি বাবা!'

'নিরুপম আসেনি?'

'না, তিনি কাজ ফেলে আসতে পারলেন না।'

শিবনাথ চোখ বুজিলেন। চোখ বুজিয়াই কহিলেন, 'এবার আমি সেরে উঠব, মাকে পেয়েছি।'

শিবনাথ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধীরা কাপড় ছাড়িতে অন্য ঘরে চলিল। বাহির হইবার মুখে নিশীথের সহিত দেখা। ধীরা বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল 'তুমি বিলাত যাওনি দাদা?'

'না। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরেছি, মার ইচ্ছা নয় আমি বিদেশ যাই, মা ভাবেন হয়ত লড়াই শীঘ্রই বাধবে।'

'কিন্তু আমায় ত জানাওনি।'

নিশীথ উত্তর এড়াইয়া কহিল 'তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, এ কয়দিন আমার যে কিভাবে কেটেছে ভগবানই জানেন।'

'তোমার এ মহত্ত্ব আমরা কখনও ভুলব না।'

নিশীথ উত্তর দিল না। কেবল হাসিল। সে হাসি তাহার মুখে খানিক বিদ্যুৎরেখার মত সুন্দর দেখাইল।

সংসারে যাহা বিশ্বাস্য নয়, জীবনে তাহা ঘটে।

শিবনাথের অসুখের পটভূমিকার উপর নিশীথ ও ধীরার প্রণয়-কৌতুকের অভিনয় চলিল। সেদিন ড্রইংরুমে কথা হইতেছিল।

নিশীথ প্রশ্ন করিল 'তোমায় ত সুখী দেখছি না ধীরা ?'

ধীরা অপাঙ্গে বিদ্যুৎ ভরিয়া উত্তর দিল 'সে প্রশ্ন অবান্তর, তুমি এষাকে বিয়ে করে সুখী হও নিশীথদা !'

'কিন্তু আমার সুখের কথা নয়, নিরুপম কি তোমাকে ভালবাসে না ?'

বিষণ্ণ ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া ধীরা কহিল, 'জানি না।'

'কিন্তু এটাই ত সবচেয়ে জানবার কথা—'

'তা নয়, তিনি বলেন যে জীবনে ভালবাসা বলে কোনও জিনিষ নেই।'

ক্রোধে নিশীথ উন্মত্ত হইল, বলিল, 'তবে সে কেন তোমায় ছিনিয়ে নিলে ?'

ধীরা উত্তর দিল না।

নিশীথ বলিয়া চলিল 'কিন্তু এ কিছুতেই হতে পারে না—'

ক্ষোভে ও দুঃখে নিশীথ বাহির হইয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

ধীরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনন্ত কালস্রোত যেন তার গতিকে কমাইয়া দিয়াছে। সে তাহার কোমল বক্ষের উপর মুহূর্তের অসহ চাপ যেন অনুভব করিতেছে। উপায়-হীন স্তব্ধতার সুনিবিড় অন্ধকার তাহাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। নিশ্চেষ্ট অবসাদে তাহার অঙ্গ এলাইয়া পড়ে।

শিবনাথ অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।

ধীরা ও নিশীথের আলোচনার অজস্র অবসর। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্তিমিত আলোকে ধীরা প্রশ্ন করিল 'তোমার বিয়ের কি হল?'

'আমি বিয়ে করব না।'

'কেন?'

'জীবনে মানুষ ত দুবার ভালবাসে না।'

ধীরা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে নীলাভ আকাশের যাদু, মুখে পুষ্পের কোমলতা, বক্ষে নদীর দুরন্ত আলোড়ন। বলিষ্ঠ, সুন্দর নিশীথ তাহার যৌবনমধুর লাবণ্যে মুগ্ধ করে। ধীরা তাহার মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া পরিতৃপ্তি চায়।

ইহাই ত জীবনের পরমাশ্চর্য্য। প্রতিক্ষণের ধ্বংস ও ক্ষয়ের মাঝে প্রকৃতি নবজীবনের সৃষ্টি করে। ধীরা অতীত ভালবাসার মোহকে নিয়া বাঁচিতে চাহে।

নিশীথ উঠিয়া আসিয়া ধীরাকে বক্ষে চাপিয়া ধরে, গদগদস্বরে বলে 'তুমি তাহলে আজও আমায় ভালবাস?'

ধীরা নীরবে এই সুগভীর আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিল। এ যেন সৃষ্টির তপস্যার হোমাগ্নি। তাহার যে হৃদয় মরিয়া গিয়াছিল, তুহিনশীতল, তাহা যেন আনন্দময় উত্তাপে তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বাধা দিতে পারিল না, আপত্তি করিতে পারিল না।

উদ্দাম প্রেমের করাল গ্রাস তাহাকে রাহুগ্রস্ত শশীর মত নিষ্প্রভ করিয়া দিল।

নিশীথ বলিল 'তুমি মল্লারপুরে ফিরে যেওনা, প্রেমহীন গৃহ তোমার নয়।'

ধীরা বলিল 'তিনি আসলে কি হবে?'

'আচ্ছা আমায় ভাবতে দাও—'

নিশীথ বাহির হইয়া গেল। ধীরার মনে ক্ষণিকের জন্য সন্দেহের মেঘ জন্মিল, কিন্তু কালবৈশাখীর যে ঝড় তাহার হৃদয়ে বহিতেছিল, তাহা সব সংশয় উড়াইয়া দিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার মজলিস বসিল। নিশীথ ধীরার হাতখানি নিয়া বলিল 'চল আমরা সিমলা যাই—'

'কিন্তু বাবাকে কে দেখবে?'

'তিনি অনেক ভাল হয়ে গেছেন, আর খবর পেলেই নিরুপম চলে আসবে—'

পতনের তিমিরাচ্ছন্ন গুহা মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। অন্ধ যুবক ও যুবতী ছুটিয়া চলিল। তাহাদের চিন্তা করিবার অবসর নাই।

ধীরা একটু আপত্তি জানাইল। নিশীথ বলিল 'এসব ভাবনা করা ভুল।' নিশীথ পকেট হইতে একটী পুষ্পহার বাহির করিল। বলিল 'এটা একবার পরবে ধীরা?'

ধীরা পুষ্পহারটী হাতে করিয়া বলিল 'কি চমৎকার! না, সত্যই ভারী সুন্দর, কিন্তু এ কেন কিনলে তুমি?'

নিশীথের মুখে আনন্দের জ্যোতি ঝলসিত হইয়া গেল। সে বলিল, 'এমনিই।'

ধীরা পুষ্পহারে প্রোথিত হীরা মণি দেখিতে দেখিতে বলিল 'আমার খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু—'

'নিশীথ প্রশ্ন করিল 'কি আবার ?'

'এটা আমি পরতে পারব না—'

'কেন ?'

'বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—'

'কিন্তু কাল পাঞ্জাব মেলে আমরা রওনা হব !'

'সত্যি ?'

'কেন তোমার আপত্তি আছে কি ?'

ধীরা উত্তর দিতে পারিল না। নিশীথ ধীরার গলায় পুষ্পহার পরাইয়া দিল এবং আদর করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল।

ধীরার অন্তরের দাবাদাহ ক্ষণিকের জন্য যেন শান্ত হইল। বাসনার যে অগ্নিজ্বালা সে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতেছিল, তাহা যেন অমৃতের স্পর্শ পাইল। রহস্যময়ী রজনী তাহার মাধুর্য্য দিয়া বিভ্রান্ত প্রণয়ীযুগলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল।

ধীরা যেন অনির্ব্বচনীয় এক আনন্দরসের স্পর্শ পাইল। ভাষাতীত, বোধাতীত মাধুর্য্য।

ধীরা ধীরে ধীরে বলিল, 'কিন্তু একি অন্যায় হবে না—'

নিশীথ 'জানিনা' বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরা যেন অজগরের মুখে পড়িয়াছে, ফিরিবার কোনই উপায় নাই। তিলে তিলে তাহাকে টানিয়া লইতেছে।

পরদিন নিশীথ মোটর নিয়া দাঁড়াইল। ধীরা পিতাকে দেখিতে গেল, শিবনাথবাবু শয্যায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন। ধীরা নমস্কার করিয়া পিতাকে বলিল 'বাবা, আমি একটু বেড়াতে চলছি।'

পুস্তকের ভাবরাশির মধ্যে শিবনাথ ডুবিয়া গিয়াছেন। কন্যার হস্ত যে বেতসলতার মত কাঁপিতেছিল, তাহার কণ্ঠে যে অস্বাভাবিকতা ছিল, তিনি তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন 'এস, দেরী কর না মা !'

ধীরার চোখে অলক্ষ্যে জল আসিল। শিশুর ন্যায় সরল এই পিতাকে প্রবঞ্চনা করিতে তাহার অন্তর ব্যথিত হইতেছিল। সে নিশীথকে বলিল 'যেয়ে কাজ নেই নিশীথদা, বাবা কষ্ট পাবেন—'

'সে কি হয়, টিকিট কেনা হয়েছে, বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে—'

ধীরা বলিল 'কোনও উপায় কি নেই ?'

নিশীথ বলিল 'না, চল এখন।'

নিয়তি অলক্ষ্যে হাসিল। মানুষ কতখানি স্বাধীন, কতখানি নির্ভরশীল, কে জানে ? তবে জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন মানুষ যেন আপনার অজ্ঞাতেই মসৃণতম পথে গড়াইয়া পড়ে। ধীরাও তেমন করিয়া নিষ্কলুষ জীবন হইতে অপরিচিত গ্লানির ঢালুপথে গড়াইয়া পড়িল।

—এগারো—

পাঞ্জাব মেল ছাড়িল।

একখানি সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীতে নিশীথ ও ধীরা। বাংলাদেশের প্রসৃত প্রান্তর গতিবেগে বৃত্তাকার হইয়া ওঠে। তরুলতা হু হু করিয়া ছোটে।

বর্দ্ধমান আসিল। ফেরিওয়ালারা হাঁকিল 'চাই সীতাভোগ, চাই মিহিদানা—'

ধীরা বলিল, 'চল এখান থেকে আমরা ফিরে যাই।'

নিশীথের মুখে বিরক্তির কালো মেঘ নামিল। সে তীব্রকণ্ঠে কহিল 'এ ত ছেলেখেলা নয় ?'

ধীরা ব্যাধভীতা হরিণীর মত চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্য প্লাটফর্ম্মে একখানি লোকাল গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটী মেয়ে-গাড়ীর মধ্যে তাহারই সমবয়সী একটি যুবতী ঘোমটা অৰ্দ্ধ তুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। একজন সুবেশ যুবক একহাতে এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়া আসিল। যুবতী হাসিয়া ঠোঙ্গাটি নিল এবং কি যেন কহিল। ধীরা তাহা শুনিতে পাইল না।

মনে হইল স্বামীকে সে গাড়ীতে উঠিতে বলিতেছে।

ধীরার মনে নিরুপমের কথা জাগিল। এমনই বিশ্বস্তহৃদয় স্বামী যখন ধীরার পলায়নের কাহিনী শুনিবে, তখন তাহার মনে কি বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা বাড়িবে, ধীরা তাহা ভাবিয়া পাইল না। সে ভাবিতে চায় না—সে যেন অপ্রতিরোধনীয় নাগপাশে পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

গাড়ী চলিল।

বন, প্রান্তর, গৃহ, মন্দির যত কিছু স্থির ও নিশ্চল সব যেন ব্যঙ্গভরে বিদায় চাহে। তাহারা যেমন দুর্দ্দম, তাহাদের গতিও তেমনই অকম্প্র, বাধাহীন, ভয়হীন, বেগে চলমান।

সন্ধ্যার ধূসর আলো নামে। নিশীথ বলে 'চা খাবে ধীরা ?'

ধীরা মুখ ফিরাইয়া লয়। বলে 'না, তুমি খাও।'

ধীরা খায় না, নিশীথও খায় না।

এ কি অস্বস্তিকর অবস্থান। যে নির্জ্জন মিলনের জন্য চক্রবাক দম্পতীর মত তাহারা ব্যাকুল ব্যগ্র হইয়াছিল, সেই নিরবচ্ছেদ নিবিড় মিলনের এই ত পরম শুভক্ষণ, কিন্তু কেন যেন সহসা বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে ! যে

গান উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতেছিল, সহসা তাহা একেবারে থামিয়া গিয়াছে।

রাত্রি আসিল। নিশীথ রেস্তঁরা হইতে দু'জনের খাবার দিতে বলিল —খাবার আসিল। ধীরা খাবার গোছাইয়া নিশীথকে দিল—নিশীথ বলিল 'তুমি খাবে না ?'

'তুমি আগে খাও ?'

নিশীথ আপত্তি করিল না। মনে করিল ধীরা একসঙ্গে খাইতে চায় না। নিশীথের খাওয়া হইলে বলিল 'এইবার তুমি খাও লক্ষ্মীটি !'

'না না, আমায় খেতে বলো না, আমি খেতে পারব না—'

নিশীথ বিচলিত হইল। বলিল 'তাহলে তুমি আমায় একটুও ভালবাস না ধীরা—

'বাবার জন্য আমার মন কেমন করছে—'

নিশীথ কথা কহিল না। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ধীরা তাহার আহার্য্য একজন ভিক্ষুককে ডাকিয়া দিল।

নিশীথ নিজের আসনে বিছানা এলাইয়া গোঁভরে চুপ করিয়া শুইল।

ধীরাও বাতি নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধকার রাত্রি। নিশীথের মনে হইতেছিল ধীরাকে জাগাইয়া সে বক্ষে তুলিয়া ধরে। নারীর যে রহস্য যুগযুগান্তর যৌবনকে ক্ষুধিত করিতেছে, সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা শান্ত করে। রজনী গভীর নিস্তব্ধতায় প্রণয়ের গভীরতম রহস্য উন্মোচন করে।

কিন্তু তাহার সাহস হইল না। যে রসধারা ধীরাকে ঘর হইতে বাহির করিয়াছিল বাহিরে আসিয়া তাহা শুষ্ক হইতে বসিয়াছে। সে তাই চুপ করিয়া কষ্টে আপনাকে সংযত করিল।

ধীরার চোখে ঘুম আসিল না। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার পিতা কুলত্যাগিনী কন্যার জন্য যে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিবেন তাহার বেদনা এতদিন সে এমন করিয়া কখনও দেখে নাই।

তন্দ্রাহীন চোখে তাহার পিতার অসহায় কাতর মূর্ত্তি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দুর্ব্বার ক্ষোভে সে চোখের জলে বুক ভাসাইল। চোখের জল যেন তাহাকে শুচি করিয়া তুলিল। যখন ভোরের সোনালি আলো আদিগন্ত দীপ্তির চন্দ্রাতপ মেলিয়াছে তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ী চলিয়াছে অশ্রান্ত বেগে। সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে, সদ্যস্নাত শুচিতায় যেন সে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

নিশীথকে বলিল 'চা খেয়েছ ?'

নিশীথ অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল 'না।'

'তাহলে আনতে বল ? আমি পাঁচ মিনিটেই তৈরী হয়ে নিচ্ছি—' এই বলিয়া বাথরুমে সে গেল। যখন সে ফিরিল, তখন ধীরার চোখে মুখে নবপ্রভাতের জ্যোতি। সে একখানি চমৎকার হরিদ্রাভ শাড়ী পরিয়াছে।

নিশীথের মনে হইল সমুদ্র-মন্থনে যে মোহিনী অসুরদের ভুলাইয়াছিল এ যেন সেই মোহিনী বেশ। তাহার পেলব চারু অঙ্গলতায় যেন পারিজাত সুরভি, তাহার সুরভি শ্বাসে যেন অনন্ত সৌরভ, তাহার গমনে যেন লাবণ্য, তাহার সমস্ত পরিবেশে যেন সঞ্চিত সুধার ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিশীথ নিশ্চিন্ত হইল। বলিল 'কাল ত কিছু খাওনি—'

চায়ের সঙ্গে কিছু দেশী খাবার নেব ?'

'নাও।'

তাহার স্বচ্ছন্দ লঘুতায় নিশীথের গত রাত্রির অভিমান গলিয়া গেল। সে মনের আনন্দে অনেক খাবার কিনিয়া ফেলিল। দোকানী খুচরা পয়সা

ফেরত দিতেছিল। সে বলিল 'থাক, ওর দরকার নেই ওটা বকসিস্ দিলাম।'

দোকানী কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় নিল।

চা-পান শেষে ধীরা বলিল 'বাবাকে আমাদের সিমলার ঠিকানা জানিয়ে একটা টেলি করে দাও—'

নিশীথ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ধীরা বলিল 'লিখে দাও শরীর খারাপ মনে হওয়ায় দু'দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি।'

ধীরা বলিল 'এতে কিন্তু কর না নিশীথদা, আমার মুহূর্তের ভুলকে তুমি আমার জীবনের চিরন্তন অভিশাপ করে দিও না—'

নিশীথ কথা কহিল না।

একটা বড় ষ্টেশনে নিশীথ নামিল। ধীরা ভাবিল নিশীথ টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সে নিশ্চিন্ত সুখ-কল্পনায় গল্প করিয়া চলিল। পথে একজন হিন্দুস্থানী ধনী তাহাদের গাড়ীতে উঠিল। ভদ্রলোক ভাল বাংলা জানেন।

ভদ্রলোক আলাপী। নিজের সঙ্গে নানাবিধ খাবার ছিল, ধীরাকে বলিলেন 'মা আমাদের খাবার একবার খেয়ে দেখুন—'

ধীরা ইহার সঙ্গে খুব আলাপ জমাইল। ভদ্রলোকও সিমলায় যাইবেন। সেখানে তাহার বৃহৎ কারবার। বলিলেন যখন যা দরকার হবে বুড়াকে খবর দিলে ঠিক পেয়ে যাবে মা।'

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন 'আপনাদের বাসা ঠিক হয়েছে মা?'

ধীরা এ প্রশ্নের জবাব দিল না।

নিশীথ বলিল 'না, গিয়ে একটা হোটেলে উঠব, তারপর একটা বাড়ী ঠিক করে নেব।'

বৃদ্ধ বলিলেন 'এর জন্য ভাবনা কি, আমার জানা অনেক ভাল বাড়ী আছে, আমি একটা দেখে দেবো।'

নিশীথ ইহার অন্তরঙ্গতা পছন্দ করিতেছিল না। সে চায় ধীরাকে একান্তভাবে নিভৃত জীবনের গোপনতম সঙ্গীরূপে—যেথানে সমাজ নাই, দায়িত্ব নাই, কর্ত্তব্য নাই। সম্ভোগের যে ফেনিল মদিরা যুব-চিত্তকে চিরন্তন বেদনা দেয়, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে আকণ্ঠ পান করিয়া আত্মহারা হইয়া সে রহিবে।

নিশীথ একাকীত্ব চাহিতেছিল। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ একবার খোঁজ করিয়া আসিলেন। কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। বৃদ্ধ বুঝিলেন, তাহার সঙ্গী তাহাকে অবাঞ্ছনীয় উপদ্রব মনে করিতেছে। উপায় নাই, বৃদ্ধ বলিলেন 'আমি আপার বাঙ্কেই থাকব, আপনাদের কোনই অসুবিধা হবে না মা—'

নিশীথের মনে যে কামনার টীকা বিষক্রিয়া করিতেছিল, তাহার বাধা তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাহার শোণিতে যে উষ্ণ আবেগ তাহাকে সে থামাইতে পারিতেছিল না। সে অপ্রসন্নভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ধীরা বলিল 'না জ্যাঠাবাবু, আপনি বুড়া মানুষ, আপনি নীচে শোন, তুমি ওপরে গিয়ে শোও নিশীথদা—'

বৃদ্ধ চমকিত হইলেন, বুঝিলেন ইহারা স্বামী-স্ত্রী নয়, খটকা জাগিল কিন্তু ধীরার ভদ্র ও সৌম্য শুচিস্মিত মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, ভিতরে কোনও গলদ নাই।

নিশীথ খুসি হইল না, কিন্তু ধীরাকে সুখী করিবার জন্য উপরে চলিল।

বৃদ্ধ নীচে শুইলেন। মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিলেন, ধীরা স্বপ্নঘোরে ডাকিতেছে 'বাবা !'

বৃদ্ধ ডাকিলেন 'মা ! মা !'

ধীরার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিল। সে জাগিল, বলিল 'জ্যাঠাবাবু—'

'হাত মুখ ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে শোও না—'

ধীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া বাথরুমে গিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া আসিয়া শুইল। নির্ভরনিদ্রা তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

—বারো—

শিবনাথ পড়িতেছিলেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—জগতের সভ্যতা আজ ধ্বংসের করালগ্রাসে। আজ চাই যুগোত্তর মহামানুষ, যিনি জীবনের চারিদিকে নূতনত্বের মাধুর্য্য পরিবেশন করিবেন, যিনি সত্যের নবতম রূপ দিবেন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নূতন পথে চালাইবেন। যদি সেই মহামানব না আসেন, পৃথিবী বিধ্বস্ত হইবে, সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে।'

শিবনাথ মনে মনে তর্ক করিলেন 'কেন ? আমরা ত চিরন্তন সত্য পেয়েছি, নূতন শিখবার ত কিছুই নেই ! পুরাতনকে ভেঙ্গে নূতন গড়বার এই স্বপ্ন, এটা প্রলাপ। আমাদের ফিরতে হবে সনাতন সত্যের মাঝে, চিরন্তন ভাবধারার সঙ্গে আমাদের যোগ বজায় করতে হবে।'

পথ্যের সময় হইল। ধীরার দেখা নাই। বিরক্তি অনুভব করিলেন, পাশে কলিংবেল ছিল। ডাকিলেন—আসিল ভৃত্য রতন। শিবনাথ রুষ্টকণ্ঠে বলিলেন 'তোর দিদিমণি কই ?'

'আজ্ঞে তিনি ত নিশীথবাবুর সঙ্গে গেছেন?'

'কোথায়?'

রতন ড্রাইভারের সঙ্গে খোস-গল্প করিতেছিল। সে শুনিয়াছে নিশীথ সিমলা যাইতেছে। সে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল, ভাবিল বাবু বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই ধীরে ধীরে বলিল 'ড্রাইভার বলছিল ওঁনারা সিমলা যাবেন।'

'সিমলা, বলিস কি?'

রতন ফাঁপরে পড়িল। দিদিমণি যে পিতাকে না জানাইয়া সিমলায় যাইতেছে এ ধারণা তার হয় নাই। সে ভয়ে ভয়ে বলিল 'ড্রাইভারকে ডেকে আনব?'

'আন, আর ঠাকুরকে আমার জন্য কোয়েকার ওটস দিতে বলে যা।'

ড্রাইভার আসিল। বলিল 'বাবুর জন্য সকালে দু'খানা সেকেণ্ডক্লাস সিমলার টিকিট কিনেছি। তারপর দিদিমণি আর বাবুকে পাঞ্জাব মেলে তুলে দিয়ে এসেছি।'

শিবনাথ চোখে অন্ধকার দেখিলেন ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রতনকে দিয়া নিরুপমকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

লেখকের কথা শিবনাথের কর্ণে বাজিতে লাগিল। 'পৃথিবী অত্যন্ত কুৎসিত হইয়াছে। সমস্ত নীতির বন্ধন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে বিদ্রোহ, বিপ্লব। কেবল বাঁচিবার জন্য বাচার সার্থকতা নাই।'

শিবনাথ কষ্টে উঠিলেন। কন্যার শয়নকক্ষে গেলেন। সমস্তই তাহার আগমনের যেন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ধীরা সামান্য একটী স্যুটকেস নিয়া গিয়াছে।

শিবনাথ ফিরিলেন, ড্রয়িংরুমে বসিয়া পত্নীর অয়েলপেন্টিং দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন 'সাধ্বী, তুমি যে ভার দিয়েছিলে, সে ভার পালনে কি আমি অক্ষমতা দেখিয়েছি ?'

শিবনাথের চোখ ভরিয়া জলধারা নামিল। বুক ভাসিয়া গেল। নিঃসঙ্গ একক জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা আজ যেন তাহাকে গিলিতে বসিয়াছে। শিবনাথ শয্যায় ফিরিলেন। দৃঢ়চিত্তে একাগ্রমনে ধ্যানে বসিলেন। বিধাতা তুমি যে কাজ দিয়াছ সে কাজ আমি পারি নাই। আমায় ক্ষমা করো। সাধ্বী কন্যাকে বিপথগামিনী করিয়া আমাদের মুখ পোড়াইও না ভগবান্, তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা। একটী সোনার সংসার ভাসাইয়া দিও না।

ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া তিনি যেন শান্তি পাইলেন। শুইয়া পড়িলেন। ঠাকুর রাত্রের খাবার নিয়া আসিল। শিবনাথ তাহাকে বকিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ডাকিলেন—'রতন'

'আজ্ঞে বাবু !'

'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিস ?'

'আজ্ঞে বাবু !'

নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু চিন্তা করিব না বলিলে ত চিন্তা দূর হয় না, সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল। শেষ রাত্রিতে ভীষণ জ্বর আসিল।

ভোর আটটায় নিরুপম যখন আসিল তখন শিবনাথবাবু প্রলাপ বকিতেছেন।

নিরুপম ডাকিল।

শিবনাথ বলিলেন—'এসেছ বাবা, শুনেছ ত সব,' তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিরুপমের দিকে চাহিলেন—সেই উদাসীন দৃষ্টিতে যেন আকুল মিনতি —যেন লোলুপ ভিক্ষা !

'ও সব ভাববেন না, আপনি নিজে একটু শান্ত হ'ন—'

শিবনাথের চোখে জল গড়াইয়া আসিল। অশ্রুধারা থামিলে বলিলেন—'ওর মা ছিলেন পুণ্যবতী—ও ভুল করলেও ওকে ফিরিয়ে এনো—ওকে আশ্রয় দিয়ো বাবা।'

নিরুপম দৃঢ়-অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিল—'আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন—আমি ওকে ফিরিয়ে আনব—আপনি একটু চুপ করে শোন, আমি ডাক্তারকে নিয়ে আসি।'

শিবনাথ বলিলেন 'আমার সব জ্বালা শান্ত হয়েছে আর ডাক্তারের দরকার নেই।'

নিরুপম শুনিল না। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'উপায় নেই—বিকাল পর্য্যন্ত হয়ত টিকবেন না—আপনি মনকে সংযত করুন—'

নিরুপম ভিজিটের টাকা দিতে গেল। ডাক্তার বলিলেন—'না ক্ষমা করবেন।'

বারটার দিকে শিবনাথের অসুখ বাড়িল।

শিবনাথ কেবল বলিতেছিলেন—'ধীরা এসেছিস্।'

নিরুপম সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। ঠিক বারটার সময় প্রাণবায়ু বাহির হইল।

শ্মশানে যখন শেষকৃত্য চলিতেছিল তখন নিরুপম মনে মনে বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ধীরার সন্ধান বৃথা। সে তাহার বিশ্বস্ত প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা।

কিন্তু চিতাকাষ্ঠের জ্বলন্ত অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া সে অনুভব করিল যেন শিবনাথের কণ্ঠে বাজিতেছে 'ওকে ফিরিয়ে এনো, ওকে আশ্রয়

দিয়ো, মৃত্যুপথিকের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

সামাজিক অনুষ্ঠানের, সভ্যতার যন্ত্রকৌশলের বাহিরে জীবনের যে প্রিয়তম উপায়ন নারী দেয়, তাহার প্রতি তাহার আর অনুরাগ রহিবে না। তথাপি প্রেমহীনা নারীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার দুঃসহ বোঝা তাহাকে চিরদিন বহিতে হইবে। ভাবিতেও তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তবু সে সঙ্কল্পচ্যুত হইবে না। অকুতোভয় চিত্তে সে এই ট্রাজেডির পরিসীমা দেখিবে, তবেই ফিরিবে নচেৎ তাহার যাত্রা ফুরাইবে না।

—তের—

পরদিন প্রভাতে কাল্কা হইতে গাড়ী হিমালয়ের পথ-বাহিয়া উঠিতে লাগিল। ধীরা হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিল। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানীর নাম লালা রামকিষণ। রামকিষণ ধরমপুর ষ্টেশনে বাহিরে গেলে ধীরা নিশীথকে প্রশ্ন করিল 'বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছ ?'

নিশীথ বলিল 'না, আমরা যে পথে চলেছি, তাতে খবর দিলে তাকে অপমানের উপর লাঞ্ছনা দেওয়া হবে।'

ধীরার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। নিজের অবস্থা সে এইবার নিন্দুকের দৃষ্টিতে বুঝিতে চেষ্টা করিল। সে ত কুলত্যাগিনী, ব্যভিচারিণী, পিতার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই—নিশীথ ইহাই ইঙ্গিত করিতেছিল।

কিন্তু ফিরিবার কি পথ নাই ? সে অশুচি নয়, দেহে আজিও নিষ্পাপ। যদিও মনের অশুচিতাই তাহাকে গ্লানি দিতেছিল, তথাপি সে দেহকে নিষ্পাপ

রাখিবে। বাহিরের জগৎ তাহাকে অবিচার করুক ক্ষতি নাই, সে ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

লালা রামকিষণ আসিয়া বলিলেন 'বাড়ীতে খবর দিলাম, তুমি আমার ওখানেই কয়দিন থাকবে মা।'

ধীরা অন্তরে অন্তরে বিধাতাকে আশীর্ব্বাদ করিল। সে যাহা চাহিতেছিল, তাহাই যেন আসিয়া পড়িয়াছে। সে কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিল 'তাই হবে জ্যাঠাবাবু!'

নিশীথ বলিল 'না, না, সে আপনাকে কষ্ট দেওয়া হবে— আমরা হোটেলেই উঠব, আপনি বরং আমাদের একটা বাড়ী দেখে দেবেন—'

"তুমি যদি আপত্তি করো, না হয় হোটেলেই উঠো, আমি জ্যাঠাবাবুর ওখানেই উঠব।"

নিশীথ অত্যন্ত বিরক্ত হইল, মুখ ফিরাইয়া কহিল 'আচ্ছা।'

সরল দ্রুমের সরল দীর্ঘ ঋজুতা চোখে পড়ে। চোখে পড়ে ঊর্দ্ধ-বিচরণ-শীল মেঘরাশি উপরের পাহাড়ের শৃঙ্গগুলিকে সস্নেহ আলিঙ্গন দিতেছে। লালা রামকিষণ বলিলেন 'বাবু মানুষকে ঘৃণা করবেন না, রামজী সবার ভিতরই আছেন।'

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিশীথকে খুসি করিল না। সে রুষ্টস্বরে উত্তর দিল 'তাই ব'লে অচেনা মানুষের কাছে ঋণের বোঝা বাড়াতে চাইনে।'

লালা রামকিষণ ধীর অচঞ্চল দৃষ্টিতে নিশীথের দিকে চাহিয়া বলিলেন 'বাবু, মানুষের ঋণের বোঝা কি ফেলতে পারেন? এই যে চলছেন সিমলাতে, কত লক্ষ কোটী মানুষের সেবায় এই যাত্রা সুগম হয়েছে, তাকি ভেবেছেন?'

নিশীথ ইহাকে মেড়ো ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়াই চলিতেছিল। আলাপে

বুঝিল বৃদ্ধ কেবল ছাতুখোর নহেন, তাহার জ্ঞানের ও চিন্তার পরিধি প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত। সে বলিল 'কিন্তু আমি ত পয়সা দিয়েই চলছি?'

'পয়সা দিলেই কি সব ঋণ শোধ হয় বাবু!'

নিশীথ উত্তর দিল না।

তারাদেবী আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রামকিষণ ধীরাকে বলিলেন 'মায়ি এখানে একদিন আসতে হবে, মা খুব জাগ্রত দেবতা সব অভীষ্টই সিদ্ধ করেন।'

'তাহলে যত শীঘ্র হয়, তত শীঘ্রই আসবো জ্যাঠাবাবু! আমি যে একটা বনচারী?'

নিশীথ ক্রুর দৃষ্টিভঙ্গী করিল। ধীরা তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

লালা বলিলেন 'এটা গাড়োয়াল রাজপুতদের রণকালী মা, ওরা মাকে পূজা দিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হ'ত।'

সিমলা পৌঁছিয়া নিশীথ পুনরায় ধীরাকে বলিল 'এমনভাবে পরকে বিরক্ত করা ঠিক নয়।'

ধীরা বলিল 'জ্যাঠাবাবুও বলছেন, মানুষের কাছে আমরা অনন্তভাবে ঋণী, সেই ঋণ না হয় আমার একটু বাড়বে।'

সিমলায় কার্ট রোডের উপর লালা রামকিষণের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ধীরার জন্য স্বতন্ত্র একটি কোঠা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। লালা রামকিষণের ধীরার মত একটি মেয়ে আছে, নাম তার সীতা।

সীতাও ভাল বাংলা জানে। লালা রামকিষণের প্রথম জীবন কলিকাতায় কাটিয়াছে।

সীতা বলিল 'দিদি, খাবার নিয়ে আসি?'

খাবার আসিল। সীতা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। এটা খাও, ওটা খাও বলিয়া আবদার করিতে লাগিল। ধীরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল।

বৈকালে সীতা ধীরার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল 'তোমার স্বামী বুঝি রাগ করে হোটেলে গেছেন?'

ধীরা বলিল 'উনি আমার স্বামী নন, আমার বন্ধু, আমার স্বামী দেশে আছেন।'

সীতা বিস্ময় অনুভব করিল। কহিল 'কিন্তু এ আমরা পারি না দিদি, পরপুরুষের সঙ্গে এমন করে আসতে আমরা পারিনে।'

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল 'কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে দোষ কি?'

সীতা বলিল 'নারীর পুরুষ-বন্ধু থাকা ঠিক নয়।'

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল 'তাহলে তোমরা আমায় ঘৃণা করছ?'

সীতা জিভ্ কাটিয়া বলিল 'না না, তুমি আমায় ক্ষমা করো দিদি, আমি তেমন কথা বলিনি, আমি তর্ক করছি।'

ধীরা প্রসঙ্গান্তর আনিবার জন্য বলিল 'সীতাকে ত দেখছি, রামচন্দ্রজী কোথায়?'

সীতার মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল 'উনি বাবার কাজই করেন, ব্যবসায়ের জন্য দিল্লী গেছেন!'

'তুমি বুঝি স্বামীকে খুব ভালবাস?'

সীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল 'দিদি যেন কি, স্বামীকে কে না ভালবাসে?'

বিকালে নিশীথ আসিল।

ধীরা সীতাকে বলিল 'যাবে বোন?'

সীতা বলিল 'রাগ করো না দিদি, তোমার ভগ্নিপতি এতে খুসি হবে না।'

ধীরা পুনরায় অনুরোধ করিল না।

যক্ষ পাহাড়ের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে নিশীথ বলিল 'আমি কি নির্ব্বাসিত যক্ষ হয়েই থাকব ধীরা!'

'নিশীথদা, তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি আমার মনকে ভুল বুঝেছিলাম, তুমি ফিরে যাও, আমি বাবাকে আসতে লিখেছি, তিনি এলে তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবো।'

'তা সম্ভব নয় ধীরা, আমাদের দেশে আমরা অভিমন্যুর মত ব্যূহভেদের একটা মন্ত্রই জানি।'

ধীরা বুঝিতে না পারিয়া কহিল 'কি বলছ?'

'গৃহের দরজা যদি বাহিরে খোলে, সে আর কখনও ভিতবে খোলে না।'

ধীরার চোখ সজল হইল, সে কাতরকণ্ঠে কহিল 'তুমি আমায় ভুলিয়ে নরকের পথে টেনে নিও না নিশীথদা, আমি সারাজীবন অনুতাপের অনলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'তুমি না হয় অনুতাপ করলে, আমি কি করব ধীরা?'

'তুমি নিশীথদা, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে, এবাকে বিয়ে করে আনন্দময় গৃহ স্থাপন করবে।'

ধীরার দক্ষিণ হস্ত আপন হস্তে ধরিয়া নিশীথ বলিল 'তুমি তাহলে আমায় ভালবাস না?'

'নিশীথদা!' ধীরা জোরে হাত ছাড়াইয়া নিল। কহিল 'মেয়েদের দেহের প্রতি তোমাদের এই লোভ কেন? পরস্ত্রীকে যদি তুমি সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে, তাহলে আজ আমার এ দুরবস্থা হত না।'

নিশীথ বলিল 'তুমি কি আমায় নীতির বক্তৃতা শোনাতে এসেছ? তুমিই না আমায় কাকুতি করে চিঠি লিখেছিলে, তুমিই না আমায় আমার সুনাম, পদমর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছ?'

'হয়ত করেছি, কিন্তু নিশীথদা, আমার চেয়ে তোমার জ্ঞান অধিক, আমি যখন অন্যায় করি, তুমি কেন তখন বারণ করলে না?'

নিশীথ বুঝিল তর্ক নিষ্ফল। কিন্তু মাদকতা যখন আসে, তখন মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব দেখে। নিশীথ বলে 'ধীরা তুমি ভাল করে বুঝে দেখো, নিরুপম হয়ত তোমায় আর নেবে না, তখন আশ্রয়হীন হয়ে তুমি কোথায় ভেসে বেড়াবে কে জানে?'

ধীরা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল 'নিশীথদা, অগতির গতি একজন আছেন, বলেই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাহত হয় নি, তুমি আমায় প্রলুব্ধ করো না, এই আমাদের শেষ দেখা, কাল থেকে তুমি আমার সন্ধান করবে না।'

নিশীথ পথ চলিতে চলিতে বলিল 'এ তোমার মিথ্যা দম্ভ ধীরা, সতী নারীর যে অহঙ্কার সেটা তোমায় মানায় না।'

ধীরা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল 'তুমি একলা পেয়ে আমায় অপমান করছ নিশীথদা।'

নিশীথ কর্কশস্বরে কহিল 'অপমান, এ মোটেই অপমান নয়, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিলে অপমান হয় না।'

ধীরা কাঁদিতেছিল, কান্না সংবরণ করিয়া বলিল 'এই অপমানই আমার সত্যিকার প্রাপ্য। তোমার যা ক্ষতি করেছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাই, তুমি পুরুষ, ক্ষতি তোমার কলঙ্ক হয়ে রইবে না, কিন্তু—' ধীরা আর বলিতে পারিল না। শাড়ীর অঞ্চল চোখে চাপিয়া কাঁদিতে বসিল।

পথিকেরা কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া নিশীথ বলিল 'চল ধীরা, তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি—'

ধীরা উত্তর দিল না। নীরবে পথ চলিতে লাগিল। লালা রামকিষণের কুঠীতে পৌঁছিয়া নিশীথ বলিল 'তুমি যদি সুখী হও, আমি আজই চলে যাবো ধীরা।'

ধীরা তাহার উত্তর দিল না, সবেগে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। নিশীথ স্তম্ভিতবিস্ময়ে খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন

।

—চৌদ্দ—

সেদিন সীতার স্বামী আসিবে, সীতার মুখে চোখে কি আনন্দ। সীতার মা নাই। বৃহৎ সংসারে সেই সর্ব্বময় কর্ত্রী। কিন্তু সকল কাজের মধ্যে আজ তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া আছে। ধীরা রহস্য করিয়া একবার বলিল 'আজ যে এত চঞ্চল বোন?'

সীতা হাসিল। আকর্ণবিশ্রান্ত চোখদুটিতে তাহার লজ্জা, বেপথু ও আনন্দ জাগিল। সে কহিল 'বলব কি দিদি, বুঝতেই পারছ, আজ উনি আসবেন।'

ধীরার মনে পড়িল, স্বামীর প্রতি সে কখনও এমন গভীর অনুরাগ দেখায় নি।

বিকালে জানকীনাথ এল। সুদর্শন সৌম্য যুবক, লালা রামকিষণের পত্রে সে সব শুনিয়াছিল। ধীরার পদধূলি লইয়া বলিল 'গরীবখানায় দিদির খুব কষ্ট হচ্ছে ত?'

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল 'না জানকীনাথ, তোমার সীতার কল্যাণে এ যে আমার সত্যিকার স্বর্গবাস হয়েছে।'

সীতার নাম শুনিতে জানকীনাথের মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। সীতা সেখানে ছিল না। দিনের বেলায় স্বামী ও স্ত্রীর যথেচ্ছ আলাপ চলিবে না।

বিকালে সীতাকে সাজাইতে সাজাইতে ধীরা বলিল 'তোমাদের এ লুকো-চুরি কেন? দিনের বেলায় কথা কইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়?'

সীতা বলিল 'তা হয়ত হয় না দিদি, তবে সামাজিক রীতি যা চলেছে, আজকাল ভাঙ্গছে, আমাদেরও হয়ত দুদিন পরে ভাঙ্গবে কিন্তু বাঞ্ছিতকে প্রতিমুহূর্ত্তে পেলে যে তার কদর আমরা ভুলে যাব—অনেক সাধনায় পাই বলেই ত তাকে এমন দুর্লভ বলে মাথা পেতে নেই।'

ধীরা তাহার চিবুক নাড়িয়া বলিল 'খুব যে কথা শিখেছিস।'

সীতা আনন্দে বলিল 'বোধ হয় তোমার কাছে দিদি—'

ধীরা আগ্রহে বলিল 'আমার কাছে কেমন করে শিখবি?'

সীতা বলিল 'তোমাদের রবি ঠাকুরের গান শুনেছি, সেদিন ফুটল কমল, কিছুই জানিনি, এও বোধহয় তাই—দাদাবাবুর জন্ম তোমার যে দুরন্ত ব্যাকুলতা, সেটাই বোধহয় আমাকে বাচাল করছে।'

ধীরা অবাক হইয়া স্বামী-প্রেম সুখী এই তরুণীর স্নিগ্ধ শান্ত মুখের দিকে চাহিল। সেখানে ব্যঙ্গের লেশমাত্র নাই। নর্ত্তনশীলা তটিনীর মত সে আপন আনন্দেই বিভোর। ধীরা ভাবিতে বসিল, নিজকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে চাহিল।

লালা রামকিষণ চিন্তাধারায় বাধা দিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন 'মায়ি!'

'জ্যাঠাবাবু!'

'নিশীথবাবু আজ এসেছিলেন, সে তোমায় নিয়ে বাংলা মুলুকে ফিরে যেতে চায়, সে বলে তুমি এখানে থাকবে না।'

ধীরা লজ্জিতা হইল, কহিল, 'এখানে থাকব না জ্যাঠাবাবু, বাবা এলে তাঁর সঙ্গে আমি কলকাতাতে ফিরে যাব।'

'আচ্ছা তাহলে নিশীথবাবুকে তাই বলে দেব।'

ফিরিবার পথে বৃদ্ধের মনে পড়িল 'তোমার বাবাকে যে তার করেছি মা, তার কোনও জবাব এল না।'

ধীরা বলিল 'বাবাকে অসুস্থ দেখে এসেছিলাম, হয়ত তার অসুখ বেড়েছে।'

'অসুস্থ দেখেছিলে মায়ি! অথচ চলে এসেছিলে—'

বৃদ্ধ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইলেন। ব্যাপারটী জলের মত তাঁহার নিকট সহজ হইয়া গেল। বাংলা সিনেমা তিনি খুব দেখিয়াছেন, বাংলার মেয়েরা যে এমন করিয়া গৃহদাহ করে তাহা তাহার জানা ছিল। তাই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন।

আবার অন্যদিক দিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করিলেন। এই বিপথগামিনী তরুণী তাহাকে অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ইহাতে তাহার পরিতৃপ্তির সীমা রহিল না। সমস্ত সৎকাজের এইপ্রকার অহেতুক আনন্দ আছে। বৃদ্ধ তাই তীব্র অপ্রসন্নতাকে সহজ করিয়া বলিলেন 'তাহলে হয়ত অপর কেউ আসলে—'

সীতা প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল 'দিদির বর হয়ত আসছে বাপুজী—'

বৃদ্ধ এইবার হা হা করিয়া হাসিয়া লইলেন, বলিলেন 'ভাল কথা বলেছিস সীতা, একথা ত আমি ভাবিনি কিন্তু কোনও তার দিলেন না ত?'

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ জানাইল, নিশীথ আসিয়াছে। ধীরার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে চায়। ধীরা বলিল 'জ্যাঠাবাবু, ওকে যেতে বলে দিন, আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না।'

'আচ্ছা মায়ি!' বলিয়া লালা রামকিষণ বাহিরে চলিলেন। সীতা প্রশ্ন করিল 'আচ্ছা দিদি, তুমি নিশীথবাবুর সঙ্গে চলে এলে কেন? ঝগড়া হয়েছিল?'

সীতার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ধীরা বলিল 'একথা আমায় জিজ্ঞাসা করিস না। পোড়ারমুখি!'

'তুমি বলবে না এই ত?'

ধীরা অন্যমনস্কভাবে বলিল 'না।'

'কিন্তু আমি জানি দিদি।'

'জানিস, কি বলত?'

'বলব? রাগ করবে না ত?'

ধীরা হাসিয়া উত্তর দিল 'নারে পাগলী, ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে?'

'তাহলে তুমি আমায় সত্যি সত্যি পাগলী বলছ?'

'তা ত বলছি।'

'কিন্তু এ তোমার ভাল হবে না দিদি।'

'কি হবে জানকীনাথকে দিয়ে নাক-কান কাটাবি? কিন্তু আমি ত স্থর্পনখার মত তোর রামচন্দ্রকে প্রেম জানাই নি।'

সীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। সেই লঘু চপল-চঞ্চল হাস্যে বিদ্যুৎরেখার মত চারিদিকে যেন জ্যোতি বিছাইয়া দেয়। ধীরাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে 'কিন্তু এমন কথা উপহাস করেও ত বলতে নেই দিদি?'

'কেমন কথা?'

'এই অপরকে ভালবাসা, আমরা যে দিদি তদ্গতপ্রাণা, আমরা যে অন্য ভাবতে পারি না, অন্য স্বপ্ন দেখতে পারি না—'

ধীরা এই তরুণীর মুখে সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তিত শুনিয়া আনন্দ লাভ করে। বলে 'কেন নয়? তোর জানকীনাথ কি আর কাকেও ভাবে না?'

'তা জানি না, সে তদন্ত কখনও করি নি, মনে হয় ভাবেন না, কিন্তু যদি বা ভাবতেন তাতে আমার ধর্ম্ম টুটত না, আমার ধর্ম্ম আমারই—'

ধীরা বলিল 'এ কথার কোনও মূল্য নেই সীতা!'

সীতা রাগিয়া বলে 'তুমি উপহাস করছ না সত্যি বলছ?'

'কেন?'

'হিন্দু মেয়ে অন্য কথা বলতে পারে না—তার সাধনার ধারা অন্যরূপ, জান ত দিদি, পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনে সতী দেহ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।'

ধীরা দুষ্টামি করিয়া বলে 'আর ধীরাদির কাছে পতির নিন্দা শুনে সীতা সতী উগ্রচণ্ডী হয়েছেন।'

উথলানো দুধে যেন তেল পড়িল। সীতা অপমানকে শান্ত করিয়া বলিল 'আমার উপরে রাগ করনি ত দিদি! তুমি অতিথি তোমার অমর্য্যাদা হলে, বাপুজী আমায় রাখবে না?'

'আমি বুঝি শুধু অতিথি সীতা।'

'তা নও, তুমি দিদি, কিন্তু তোমায় অতিথির সম্মান দিতে হবে, বাপুজীর এই ত কড়া আদেশ, অতিথি বাপুজীর কাছে নারায়ণ।'

ধীরা ভাবিতে বসে। এই স্বাভাবিক সহজ ভাবধারা সে পায় নাই। বিদেশী পুস্তক সে পড়িয়াছে, সেখানে জাতির মর্ম্মের কোনও সন্ধান নাই। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যে সভ্যতার ধারা যুগযুগান্তর বহিয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার এতটুকু পরিচয় নাই। দার্শনিক পিতা তাহাকে পরে

ভারতীয় দর্শন পড়াইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন কিন্তু সে সংকল্প কাজে পরিণত হয় নাই।

স্বামীর গৃহে সে কেবল উল্কার মত বিদ্রোহের শিখা বাহির করিয়াছে, কিছুই শেখে নাই। তাই এই সরলার কথাগুলি তাহার অত্যন্ত মধুর লাগিল।

ধীরা রহস্য করিয়া বলিল 'স্বামী নারায়ণ, অতিথি নারায়ণ পূজা করবে কেমন করে?'

সীতা বলিল 'তুমি সব জান দিদি, অথচ আমায় খেলাতে চাও বুঝি?'

'নারে পাগলি না, আমি পড়েছি বিলেতি কেতাব, তাই তোর সুধাকণ্ঠে এসব মিঠে কথা আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমি কেবল তুলসীদাসের রামায়ণ পড়েছি দিদি।'

সন্ত তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি সে মনে মনে দিল। একটী সুবৃহৎ মানব সমাজকে তুলসীদাস জীবন-যাত্রার রীতি ও নীতি দিয়াছেন ইহার চেয়ে মহত্তর অবদান আর কি হইতে পারে?

ধীরা বলিল 'কিন্তু আমার কথার জবার্ব দিলেন না ত বোন?'

'সবই ত নারায়ণ, কিন্তু সব নারায়ণ ত একই সেবাপূজা চান না। পিতৃনারায়ণ চান ভক্তি, পতিনারায়ণ চান প্রেম, পুত্রনারায়ণ চান বাৎসল্য। নারায়ণ এমন করেই বিচিত্র হয়েই মানুষকে সার্থক করে তোলেন দিদি।'

ধীরা সীতাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পেলব ওষ্ঠাধরে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া বলিল 'আমি অতিথিনারায়ণ হয়ে দূরে থাকব না—আমি হব—।'

সীতা কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল 'সখীনারায়ণ!'

'বা রে, তুই যে সত্যি কবি সীতা।'

'কবিতা পরে হবে, কিন্তু এখন আমায় ছাড়ো।'

'কেন জানকীনাথের প্রাপ্য আমি চুরি করে নিচ্ছি।'

'যান দিদি আপনি খুব দুষ্টু, দাদাবাবু এলে আপনাকে আমি এমন নাস্তানাবুদ করব, তখন দেখবেন—'

ধীরা শান্ত উদাস নিষ্প্রাণকণ্ঠে বলিল 'আচ্ছা করিস্, কিন্তু তিনি কি আসবেন ?'

'আস্‌বেন দিদি, আমি গণতে পারি 'তিনি আসছেন তাইত।'

ধীরা বলিল 'কি এবার কীর্ত্তন গাইবি ?'

'না, সে গাইতে হলে তোমায় গাইতে হবে দিদি, তুমি ত বিরহিণী রাধা।'

ধীরা বলিল 'চালাকি করিসনে সীতা !'

—পনর—

পরের দিন দুপুরবেলা সীতা জানকীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইল। স্বামী ও স্ত্রীর দিনে সাক্ষাৎকার হয় না বলিলেই হয়। তাই জানকীনাথ খানিকটা বিস্মিত হইল। হাসিয়া হাসিয়া বলিল—'কি হুকুম মহারাণি!'

সীতা লজ্জিত হইয়া বলিল—'দিদি রয়েছেন যে !'

'থাকুন না, স্বয়ং রামচন্দ্রজী মায়ামৃগের পিছনে ছুটলেন, আর আমরা ত ছার—কি বলেন ধীরাদি ?'

ধীরা হাসিল—এই দম্পতীর প্রেমাভিনয় সে যত দেখে, ততই মুগ্ধ হইয়া যায়। বলিল—'মন্দ কি ভাই, এতে কি আনন্দ নেই—"

'আনন্দ নেই সেকথা বলিনে ত দিদি।'

সীতা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'যাও ষ্টেশনে যাও।

'কেন কি দরকার?'

'এইটাই বুঝতে পারছ না।'

জানকীনাথ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। সীতা বলিল—'আজ দিদির বর আসছেন।'

জানকীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—'কিন্তু আমি চিনব কি করে?'

সীতা বলিল—'সে তুমি চিনতে পারবে—'

'তার পেয়েছ বুঝি?'

'না আমার মন ডেকে বলছে।'

ধীরা হাসিয়া বলিল—'এটাও মায়ামৃগের পিছনে ছোটা—'

'হোক, তুমি দেরী কর না, যাও।'

'যো হুকুম মহারাণি!' বলিয়া কৃত্রিম অভিনয় করিয়া জানকীনাথ বিদায় লইল।

জানকীনাথ চলিয়া গেলে ধীরা বলিল, 'এ কি করছ বোন!'

'ঠিকই করছি, আমার মন ডেকে বলছে যে তিনি আসছেন, সতীর আহ্বান ব্যর্থ হবে না দিদি!'

ধীরা কুণ্ঠিতস্বরে বলিল 'কিন্তু তোরা যাকে সতী বলিস, আমি ত সে সতী নই।'

'কে বলেছে—তুমি সত্যই সতী।'

ধীরা অশ্রুসজল চক্ষে সীতার দিকে চাহিয়া বলিল—'তোর মত করে আমি ত কোনও দিন স্বামীর পূজা করি নি—'

সীতা বলিল 'করেছ দিদি, নিজে হয়ত জান নি—আমাদের দেশের সতী মেয়েদের সাধনা হারায় না, আমাদের রক্তে মাংসে হাড়ে হাড়ে তাদের তপস্যার শক্তি রয়ে গেছে কি না?'

কি অটল বিশ্বাস, কি প্রগাঢ় ভক্তি। ধীরা সত্যই বিস্মিত হইল। ডিগ্রির মোহে স্কুল কলেজে না গিয়া সে যদি দেশের এই চিরন্তন সাধনার পাঠশালে পড়িতে পারিত তাহা হইলে হয়ত তাহার জীবনে এমন দুঃখ-গভীর ট্রাজেডি ঘটিত না। কিন্তু আজ অনুতাপ করিয়াও সেই সুখস্বর্গে ফিরিবার উপায় নাই। ধীরার অজানিতে বুক ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।

সীতা বলিল—'চল দিদি আজ তুমি খাবার তৈরী করবে।'

ধীরা হাসিতে হাসিতে বলিল—'তুই সত্যি সত্যি পাগলী হয়েছিস বোন—তিনি আসবেন তার স্থিরতা কি?'

'আসবেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু যদি না-ই বা আসেন, আমি বাঙ্গালীর মত খাবার বানাতে শিখব।'

ধীরা সীতার সঙ্গে চলিল।

নিরুপমের শুষ্ক-বিশীর্ণ মুখ—অন্তরে উদাসীন বৈরাগ্য। কোথায় যে ধীরার সন্ধান মিলিবে, সে সম্বন্ধে তাহার এতটুকু ধারণা নাই। ভবিষ্যৎ তাহার নিকট একান্ত শূন্য—পরিকল্পনাহীন নির্জ্জীবতা। উষর মরুভূর মত দীর্ঘায়ত ব্যাপক দুঃখের পাথার। নিরুপম আত্ম-আলোচনা করিতে বসে।

সে হয়ত স্বামীর কর্তব্য পালন করে নাই। তাই হয়ত এই অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

সিমলায় নামিয়া সে কোথায় কোনদিকে যাইবে ভাবিয়া পায় না। এখানে বাঙ্গালীদের একটী কালীবাড়ী আছে তাহা সে শুনিয়াছিল। মনে করিল সেখানে উঠিয়া নবাগতদের সন্ধান লইবে।

এমন সময় জানকীনাথ আসিয়া বলিল—'আপনি নিরুপমবাবু?'

এই আগন্তুকের প্রশ্নে সে বিরক্ত হইল, অনিচ্ছায় বলিল—'হ্যাঁ!'

'যাক, বাঁচিয়েছেন, চলুন আমাদের গরীবখানায়—'

নিরুপম এই অপরিচিতের কথার অর্থ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহে।

জানকীনাথ হাসিয়া বলে—'আমি গুণ্ডা নই বাবু!'

নিরুপম বলিল 'নাইবা হলেন গুণ্ডা, কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব কেন?

'ভয় করছেন?'

'ভরসাই বা কি?'

জানকীনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে, 'ধীরাদি আমাদের ওখানেই আছেন।' নিরুপম বুঝিতে পারে না। তাহার সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হইতে বসে। সে নিঃশব্দে জানকীনাথের সঙ্গে চলে। অন্তরে শত প্রশ্ন জাগে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়।

অনিশ্চিতের দিকে সে ভীরুর মত আত্মসমর্পণ করে। জানকীনাথ তাহাকে রাস্তার দ্রষ্টব্যস্থান পরিচিত করাইতে করাইতে চলে। নিরুপম শোনে না, অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে।

জীবনে এই যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে, তাহার কোনও দিন উন্মোচন হইবে কি না সে ভাবিয়া পায় না।

জানকীনাথ গল্প করিয়া চলে। 'বুঝেছেন দাদা মেয়েদের বায়না বয়েই পুরুষদের কাটে। বলা নেই, কওয়া নেই—সীতা আমায় ডেকে পাঠাল আর এই দেখুন ভরা দুপুরে কাজ কর্ম্ম ফেলে আপনার জন্য হয়রানি করছি—'

'নিরুপম প্রশ্ন করিল, সীতা কে?'

জানকীনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল 'এইটাই বুঝলেন না দাদা, সীতা আমর কলিজা—'

নিরুপম উৎসাহ অনুভব করে না। চুপ করিয়া রহে। জানকীনাথ গল্প বলে 'শ্বশুর মহাশয় গাড়ীতে দিদিকে পান। সেই যে তার কেমন মায়া হল, আপন মেয়ের মত দেখেছেন আমরাও দিদি পেয়েছি—'

নিরুপম কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। বলিল, নিশীথবাবু কোথায়?

'আমি ত তাঁকে দেখিনি, সীতার কাছে শুনেছি তিনি ধীরাদির বন্ধু, তিনি দিদিকে নিয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। দিদি যাননি। দিদি আপনারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন?'

জানকীনাথ সরল লোক। সংসারে যে কুটিলতা আছে, একথা তাহার চিত্তে জাগে না। সে পাখীর মত আপন আনন্দের আতিশয্যে গান করিয়া চলে, শ্রোতার মনোরঞ্জনের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। নিরুপমের পাণ্ডুর মুখেও ক্ষণিকের জন্য আনন্দদ্যুতি খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহার সংসারী অন্তর বলিল ইহা অসম্ভব। যে নারী তাহাকে ভালবাসে নাই, অপরের প্রেমের জন্য গৃহ ছাড়িয়াছে, সে তাহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে, ইহা যে স্বচক্ষে দেখিলেও সে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

লালা রামকিষণের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় পৌঁছিয়া নিরুপম বিস্ময় অনুভব করিল। দ্বিতলের একটী ঘরে তাহাকে বসাইয়া জানকীনাথ বলিল 'আপনি স্নান করবেন ত?'

'স্নান করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে না ত?'

জানকীনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল 'না, না গরম জলের ব্যবস্থা আছে।'

নিরুপম স্নানাগারে চলিল। চমৎকার শ্বেত মার্ব্বেল পাথরের বৃহৎ চৌবাচ্চা। কল ছাড়িয়া দিলে গরম জলে ভরিয়া গেল তাহার সহিত শীতল জল মিশাইয়া নিরুপম নামিয়া পড়িল।

কি স্বস্তি! উলঙ্গ অবগাহনে কি পরম আরাম! সমস্ত লোমকূপ দিয়া সে যেন শান্তি অনুভব করিতেছিল। চোখ বুজিয়া নিরুপম ভাবিতে বসিল। ধীরা কেন নিশীথকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপরিচিত অনাত্মীয় বিদেশীর গৃহে আশ্রয় নিয়াছে।

আধ ঘণ্টা পরে সে যখন ফিরিল, তখন তাহার 'ঝড়োকাকের' মত চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। জানকীনাথ বলিল, 'চলুন এবার আহারের ডাক হয়েছে।'

ভিতরের বাড়ী ঢুকিতে সীতা অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি নিল, বলিল—'আমি সীতা, দাদাবাবু', জানকীনাথ বলিল—'বলেছি ত দাদা—

সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি
সীতা বিনা রাম যেন মণিহারা ফণী—'

সীতা উত্তর দিল না। জানকীনাথের দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া চোখ নামাইয়া লইল।

আর একটু চলিতেই ধীরা আসিয়া প্রণাম করিল।

নিরুপম কতক বিস্ময়ে কতক কৌতূহলে ধীরার দিকে চাহিল। তাহার শান্ত নিবিড় মুখশ্রী বেদনা-ব্যথিত, কিন্তু সেখানে গ্লানির চিহ্ন নাই।

ধীরা কাহাকে কখনও প্রণাম করে নাই। হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিয়াছে। আজ তাহার প্রণতি তাহাকে অবাক করিল।

নিরুপম একটীও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে মূল্যবান গালিচার আসনে গিয়া বসিল। জানকীনাথ বলিল 'আমায় এবার বকশিস্ দিতে হবে—আসামী ধরে আনতে আমার অনেক হয়রানি হয়েছে—'

সীতা বলিল 'কিন্তু সে ত আমারই প্রাপ্য, আমিই ত বলেছিলাম, দাদাবাবু আসছেন—'

ধীরা পাশে বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। মনে হইতেছিল সে পিতার অসুখের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আজ যেন এই একান্ত প্রিয়জন একান্ত দূর হইয়া গিয়াছেন। দু'জনে যেন আজ লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝে দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—মধ্যে তরঙ্গ-মুখর সমুদ্রের গভীর ব্যবধান।

জাননকীনাথ বলিল 'আমি এবার আসি দাদাবাবু, গরীবখানাকে আপনার বলেই মনে করবেন—'

নিরুপম কথা বলিল না। নীরবে আহার করিয়া চলিল। তাহার মনে নানা বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলিতেছিল।

সীতা বলিল 'জানেন দাদাবাবু, দিদি নিজের হাতে এসব করেছেন—'

নিরুপম ধীরার মুখের দিকে চাহিল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'তার ত প্রয়োজন ছিল না—' স্বামীর প্রথম প্রিয় সম্ভাষণ। ধীরার কোমল বুকে যেন শেল বিঁধিল। সে অধোমুখে বসিয়া রহিল। একথার জবাব দিল সীতা, 'সে প্রয়োজন ত আপনি বুঝবেন না দাদাবাবু!'

নিরুপম আশ্চর্য্য হইয়া এই শঙ্কাহীন প্রগল্‌ভা তরুণীর দিকে চাহিল, বলিল 'কেন?'

'আপনি যদি ভালবাসতেন, তাহলে কি দিদি এমন করে অভিমান দেখাতে পারতেন ?'

নিরুপম নিরুত্তর রহিল। নব্যা তরুণীকে সে বিবাহ করিয়াছে—তাহার অন্তরে ঔপন্যাসিক ভাবাকুলতা, সে চাহে প্রণয়ের উচ্ছ্বাসলীলা, বিলাস। নিরুপম পবিত্রতার প্রতীক সাজিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রণয়ের আদর্শ দেখাইবার ভাবনা সে কোনও দিন ভাবে নাই। সে প্রচ্ছন্ন শ্লেষে উত্তর দিল 'সে আমার অপরাধ—'

সীতা বলিল 'অপরাধই ত দাদাবাবু, ঘরে নিলেই ঘরণী হয় না। তাকে সমাদরে প্রেমের সিংহাসনে বসাইলেই ত পুরুষের যোগ্যতা প্রমাণ হয়।'

'সে ত আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তোমার দিদি প্রেমিককে খুঁজে নিয়েছেন।'

ধীরা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, এই মেয়েটির সম্মুখে বর্ব্বরতা না করলেই ভাল হয়—,

স্বামী ও স্ত্রীর প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ। সেখানে পারিজাত গন্ধ নাই, রহিয়াছে বজ্র ও বিদ্যুত। সীতা সহাস্যকণ্ঠে বলিল 'তার জন্য দুঃখ করো না দিদি, এ আঘাত আমাদের মাথা পেতেই নিতে হবে—'

নিরুপম বলিল 'আমায় ক্ষমা করুন।'

সীতা বলিল 'না না এখন তর্ক থাক। আপনি খেয়ে নিন, কই মিষ্টি ত আদবেই ছুঁলেন না। না না খেতে হবে, ছানা কাটিয়ে সন্দেশ তৈরী করেছি এটা খেতেই হবে।'

নিরুপম পরম আনন্দে আহার শেষ করিল। আহার শেষে সীতা নিরুপমকে ধীরার শয়নকক্ষে নিয়া বসাইল। হাসিয়া হাসিয়া বলিল 'আজ বাসর শয্যা সাজাব, আমায় খুসি করতে হবে দাদাবাবু!'

নিরুপম এই হরিণীর মত লঘুচরণা তরুণীর লঘুতা উপভোগ করিতেছিল। সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আজ ত আমরা থাকতে পারব না বোন?'

'রহস্য করছেন দাদাবাবু!'

'না, ধীরা, তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন।'

এই আকস্মিক বজ্রাঘাত ধীরাকে সম্মোহিত করিল। সে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া বলিল 'বাবা নেই।'

নিরুপম বলিল 'না, তার শ্রাদ্ধ করতে হবে। আজই আমাদের রওনা হতে হবে। কাল বারাণসীতে শ্রাদ্ধ করবে তুমি।'

ধীরা ইহা শুনিতেছিল না অস্ফুটস্বরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সীতার যত্নে ধীরার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। কিন্তু সে পাগলিনীর মত উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চাহিয়া রহিল। নিরুপম বলিল 'আপনার বাবাকে খবর পাঠান'। লালা রামকিষণ এলেন। সকল বিষয় শুনিয়া তিনি বলিলেন 'বাবুজী' অন্যায়ের ফল একজন ভোগ করেন, বিশ্বনাথ তাই করেছেন, সেই অন্যায়কে তুমি আর বাড়িও না বাবু, মায়ি আমার লক্ষ্মীস্বরূপা—' নিরুপম উত্তর দিল না।

গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া লালা রামকিষণ বলিলেন—'মায়ি আর একবার এস।'

ধীরা পদধূলি লইয়া বলিল 'আপনার পায়ের ধূলি নেওয়ার পথ যদি ফিরে পাই তবে আসব জ্যেঠাবাবু আশীর্ব্বাদ করুন।'

লালা বলিলেন 'পাবে মায়ি, ফুলের মত তোমার শুচি মন ধূলায় ধূসরিত হয় না, তুমি তোমার আপন আসন ফিরে পাবে মা।'

—ষোল—

মোহাচ্ছন্নের মত বারানসীধামে গঙ্গাতীরে ধীরা পিতার শেষকৃত্য সমাপ্ত করিল।

নিরুপম ফিরিবার দিন বলিল 'তুমি এখন কি করবে ধীরা?'

ধীরা বিহ্বলদৃষ্টি মেলিয়া বলিল 'তুমি যা বল।'

'আমি ত কোনও দিন তোমায় পথ দেখাইনে, তুমি নিজেই নিজের পথ দেখে নিয়েছ?'

ধীরা নিরুপমের পাদুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল 'তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে না?'

নিরুপম শান্ত স্নিগ্ধস্বরে কহিল 'এ ত ক্ষমার কথা নয়।'

ধীরা বলিল 'আমি দেহে অশুচি না হলেও মনে প্রাণে অশুচি, জানি তোমার পাশে আমার আসন হবে না। তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও, পথের বার্ত্তা বলে দাও।'

এমন সময় পাণ্ডা শিউশরণ আসিল। বলিল 'মায়ি আজ যাওয়া হবে না।'

নিরুপম জিজ্ঞাসা করিল 'কেন?'

'আজ বিশ্বেশ্বরের পূর্ণারতি হবে—আজ আরতি দেখতে হবে।'

ধীরা বলিল 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার সময় ধীরা মুগ্ধচিত্তে আরতি দেখিল।

ভক্তিনতচিত্ত নানা দেশদেশান্তরের ভক্তেরা মিলিয়াছে। সুগম্ভীর বাদ্য বাজিতেছে। ধীরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। দেবতার আরতির প্রতি তাহার

শ্রদ্ধা ছিল না। সে নীতিকেই চরম করিয়া দেখিত। নিজের জীবনের পতন ও বেদনায় সে আজ শিখিয়াছে দুর্ব্বল মানুষের আশ্রয় চাই। তাইত নীতি ধর্ম্মের সহিত যখন যুক্ত নয়, তখন সে সার্থকতায় ভাস্বর হয় না।

নীতি চিরপ্রগতিশীল আদর্শ। দিগন্তের সূর্য্যের মত সে কেবল পথিককে তাহার সান্নিধ্য দেখাইয়া ভুলায়। পথিক প্রান্তরশেষে তাহাকে পাইবে ভাবে, কিন্তু সেখানে পথের শেষে সূর্য্য রহে না—নূতন প্রান্তর জাগে—নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। নীতি তাই চিরন্তন যাত্রা, সমাপ্তিহীন, প্রাপ্তিহীন পথের আহ্বান। ধর্ম্ম নির্ভর আশ্রয়। আত্মা সেখানে অভিমানকে ধূলায় ফেলিয়া ভগবৎসত্তায় নিজেকে বিলাইয়া দেয় এবং জগতে মহিমায় পরিপ্লুত হয়।

পাওয়া ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, পাওয়াই ধর্ম্মের আরম্ভ। মানুষ যেখানে তাহার শান্তজীবনে অনন্তের স্পর্শে পায়, সেখানে নীতি ধর্ম্মের সূচনা। ধর্ম্ম গতিহীন যাত্রা নয়। ধর্ম্মে বিকাশ আছে—সে বিকাশ বাহিরে নয়, তাহা অনন্তের মাঝেই নব নব ভাবে উপচীয়মান প্রকাশ। ধীরা আরতির মধ্যে নূতন আলোক পাইল। সত্য, শিব ও সুন্দরকে সে এতদিন এমন করিয়া অনুভব করে নাই। নিজের জীবনের অশুচিতা সে এবার কল্যাণে শুদ্ধ করিবে এই সংকল্পের আনন্দে বিগতগ্লানি হইয়া দাঁড়াইল।

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সে নিরুপমকে বলিল 'আমায় এখানে রেখে যাও। বিশ্বেশ্বরের চরণে আমি জীবন উৎসর্গ করব।'

'কেন?'

'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

নিরুপম পলকহীন নেত্রে রাজরাজেশ্বরীর মত জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরার দিকে

চাহিল। তাহার সঙ্কল্পদৃঢ় আননে পরম প্রসন্নতা, তাহার চোখে নিবৃত্তির নিবিড় আনন্দ। নিরুপম বলিল 'তা হয় না ধীরা।'

ধীরা কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, 'কেন ?'

'তুমি তপস্বিনী যদি হতে চাও, আমার ঘরেই তোমার তপস্যা চলবে।'

'না, না সে হয় না।'

'কেন হয় না ?'

'আমি যে স্বৈরাচার করেছি, সে আমাকে অশুচি করেছে। এই অশুচি মন নিয়ে দেবতার পূজা হয় না। তোমার গৃহ হবে আমার কল্পনার অমরাবতী, তোমার চরণধূলি হবে আমার আকাঙ্ক্ষিত অমৃত, কিন্তু তাকে ত অত সহজে আমি নিতে পারব না ?'

নিরুপম বক্তার ভাবগম্ভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর শান্তকণ্ঠে বলিল, 'পাপের জন্য তুমি ভয় করো না। মানুষ যখন তার নির্ম্মল স্বকীয়তাকে ভোলে তখনই সে পাপ করে। মানুষ স্বাধীন তাই সে তার জীবনের বিকাশকে স্বেচ্ছায় ভাঙ্গতে চায়, কিন্তু যখনই সে-ভুল বুঝে, আবার আত্মার মহিমময় পথে চলে, তখনই তার সব ধূলা মুছে যায়, তখনই আবার সে পদ্মের মত সুরভিময় সৌন্দর্য্যময় হয়ে ওঠে।'

ধীরা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে 'সত্যি ?'

নিরুপম বলে, 'তোমায় মিথ্যা বলে আমার লাভ নেই, আমাদের দু'জনেরই ভুল হয়েছে। তোমায় সত্য করে পেতে হলে যে তপস্যার প্রয়োজন ছিল সে তপস্যা আমি করি নি। ভেবেছিলাম তুমি ফুলের মত আপনিই ফুটে উঠবে।'

ধীরার আনন্দ ধরিল না, বলিল, 'তবে চলো আজই আমরা যাই।'

বন্ধন ও মুক্তি

বারাণসীধাম হইতে রাত্রের গাড়ীতে তাহারা যাত্রা করিল। জ্যোৎস্না-হসিত রজনী। নিসর্গের মাধুরী খুবই ভাল লাগিতেছিল। প্রকৃতির অন্তরে যে পরিপূর্ণতা, সে পরিপূর্ণতাকে ধীরা গ্রহণ করিতে চাহিতেছিল। এই গাড়ীতে একজন সাধু চলিতেছিল। ভক্তবৃন্দ তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তাহাদের প্রশ্নোত্তর ধীরাকে আকৃষ্ট করিল। ধীরা ফিরিয়া চাহিল।

স্বামীজীর মুখে সত্যই লাবণ্য ঠিকৃরিয়া পড়িতেছে। পৌরুষ ও বীর্য্য যেন সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, অথচ মুখে যেন অসীম করুণা, যেন দিব্য কমনীয়তা।

ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য কি প্রভু?'

স্বামীজী হাসিলেন। জলদগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'এত ব্যাপক প্রশ্ন। এক কথায় বলতে পার, পরিপূর্ণতা আমাদের কাম্য। মানুষ কাজ করছে —অবিশ্রান্ত অবিরাম। সে কাজকে সমস্ত তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করে বৃহতের দিকে নিয়োজিত করতে হবে।'

ভক্ত বলিল, 'কিন্তু এ ত নীতির কথা?'

স্বামীজী বলিলেন, 'নীতি কি তুচ্ছ বাবা? নীতি ত জীবনের অংশ নয়, সেটা যে জীবনের সব ছেয়ে আছে। নীতি পায়না পরমকে একথা সত্য, তাকে পাওয়ার জন্য চাই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ঈশোপনিষদে এই কথাই বলেছে, যা কিছু করবে তাকে ভাগবত অনুপ্রেরণায় অনুরঞ্জিত করে করবে।'

ভক্ত প্রশ্ন করিল, 'আমরা যে পারি না, আমরা যে ভুল করি, আমরা যে পাপ করি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'এইটাই তাঁর লীলা। পশু পক্ষী ভুল করে না, তারা চলে সহজাত সংস্কারে। কিন্তু মানুষকে তিনি ভুল করবার স্বাধীনতা

দিয়েছেন, মানুষ তখনই ধর্ম্মকে পায়, যখন সে বিশৃঙ্খলতা ত্যাগ করে, যখন সে ঐকান্তিক আগ্রহে পরম প্রেয়কে স্থির করে নেয়। ভগবৎ-প্রেমই এই জীবনের মাপকাঠি; চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করলে, মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য সত্যের পথে ও কল্যাণের পথে চলে—সেইটাই সকলের কাম্য।'

অন্য ভক্ত প্রশ্ন করিল, 'যে ভগবানকে পায় নি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'ভগবানকে সবাই উপলব্ধি করে না একথা সত্য, কিন্তু পরমার্থ বলে কিছু মেনে নেওয়া প্রয়োজন, আর তাই যখন মানুষ মানে, তখন সেই পথেই তার চিত্তের উন্মেষ হয়।'

প্রশ্ন হইল 'আমরা ঠিক ধরতে পারিনে বাবা!'

স্বামীজী বলিলেন, 'ধরা কি এত সহজ? আমাদের দেশের সতীরা স্বামীকে পরমার্থ করে দেখেন, সে দেখায় তাদের জীবন ধন্য হয়ে যায়। স্বামী পরমার্থ নয়, কিন্তু তাকে পরমার্থ করে দেখবার ফলে স্ত্রীর চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সত্যের সাক্ষাৎ পায়।'

ধীরার মনে যেন বিদ্যুৎ-শক্তির আঘাত লাগিল। সে যে পরশমণি খুঁজিতেছিল, এই ত সেই পরশমণি। অপ্রত্যক্ষ ভগবানকে সে বোঝে না, বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ যে দেবতা, সে দেবতা ত তেমনই প্রসন্ন, তেমনই উদার।

সে ত সীতাকে দেখিয়াছে। অশিক্ষিতা এই তরুণী যে আনন্দ ও সত্য লাভ করিয়াছে, তাহাই পাইলে সে বর্ত্তিয়া যায়। স্বামীজীর আলাপ চলিল, কিন্তু ধীরা সেদিকে আর কর্ণপাত করিল না। সে জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতেছে। নিশীথ নিদ্রাসুপ্ত পল্লী ও নগরী, বন ও প্রান্তর চলিতেছে। রাত্রিচর পাখী ধ্বনি করিতেছে। এই

যাত্রার পরমোৎসবে সে রিক্তা, দীনা হইয়া আর্ত্তনাদ করিবে কেন ? সে ত পথের বার্ত্তা পাইয়াছে।

সারাজীবন ধরিয়া এই সত্যকে সে সার্থক করিয়া তুলিবে। আধুনিকতার মোহ নারী জীবনের এই কাব্য অপহরণ করিতে বসিয়াছে। স্বামীকে তরুণী আর দেবতা বলিয়া ভাবে না। নিজেকে দাসী মনে করে না। আত্ম-প্রীতির কামনা তাহাকে বিষজর্জ্জরিত করিয়া তোলে।

ধীরা তন্দ্রাতুর চোখে স্বপ্ন দেখে। হিমালয়ের তুষারসুন্দর বনভূমিতে সে তপস্বিনী গৌরী হইবে। রুদ্রের যে পিঙ্গল জটাজাল কালবৈশাখার মত্ত ঝটিকায় এলাইয়া পড়ে, তাহার যে বিষাণ বাজে, সেই দুরন্ত ও দুর্ব্বারকে সে গ্রহণ করিবে। শুচিস্মিতা কল্যাণী সেবিকা হইয়া সে মহাদেবকে প্রেমাতুর করিয়া তুলিবে। শ্মশানচারী সন্ন্যাসীর গৃহে সে অন্নপূর্ণা হইয়া অন্ন ও প্রসাদ বিতরণ করিবে।

ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে কলিকাতায় আসিয়া। চিরপরিচিত সেই হাওড়া ষ্টেশন, সেই জনসমারোহ, সেই নানা বিচিত্র লোকের মিশ্রিত কলরব, সেই পরিচিত নরনারী।

ধীরার ভাল লাগিল। কাহারও সহিত তাহার কোনই যোগ নাই, অথচ সে আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিল।

পিতৃগৃহে ফিরিল।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু দুলালী কন্যাকে সমাদর করিতে কেহ আসিল না। রিক্ত শূন্যতার হাহাকারে তাহার চিত্তকে যেন নিপীড়িত করিতে বসিল।

নিরুপম বলিল, ‘তুমি কি কিছুদিন এখানে থাকতে চাও ধীরা ?’

ধীরা কাতরতায় বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ‘না

এখানে আমি থাকতে পারব না। তুমি নিয়ে চল, এখানে প্রতিদিন আমি শুনব অশরীরী অভিশাপ!'

নিরুপম ধীরাকে ধরিয়া বলিল, 'এত বিচলিত হয়ো না, আমি ত বলেছি, তুমি নির্ম্মল শুচি হয়ে গেছ।'

অবোধ বালিকার মত সে প্রশ্ন করিল, 'সত্য বলছ, আমি ভাল হয়ে গেছি? কিন্তু কই, আমি ত কিছু বুঝতে পারছিনে—'

'অভিশাপ নয়, স্বর্গ থেকে জনক জননী আশীর্ব্বাদ করছেন, তুমি কৃতার্থ হয়ে যাবে।'

ধীরা কথা কহিল না। ড্রইংরুমে পিতা ও মাতার যে সুবৃহৎ তৈলচিত্র ছিল তাহাদের দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। ধ্যানমগ্না ধীরাকে সেখানে রাখিয়া নিরুপম রতনের সন্ধানে চলিল।

খানিক পরে চা ও খাবার নিয়া উভয়ে ফিরিল। তখনও ধীরার তন্ময়তা ভাঙ্গে নাই। পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া ধীরা বলিল, 'রতন তুই বাবাকে যেতে দিলি কেন?'

রতন উত্তর দিল না। চোখে কাপড় দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধীরাও কাঁদিল।

ধীরা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি ত দর্শন পড়েছ—সংসারে এত অপচয় কেন?'

নিরুপম উত্তর দিল, 'বিধাতার বিভূতি সেই। অপচয় আছে বলেই উপচয়ের মূল্য আছে। অন্ধকার আছে বলেই আলোর গৌরব, পাপ আছে বলেই পুণ্যের সমাদর।'

প্রভাতের আলো নীলাভকক্ষ দিয়া আসিয়া ড্রইংরুমে অপূর্ব্ব শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছিল। ধীরা উঠিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমি

ভগবানকে জানি না, ধর্ম্মকে জানিনা, তোমাকেই জানি, তোমার পায়ের ধূলি হয়ে যেন আমার সারাজীবন কাটে।'

নিরুপম তাহাকে বক্ষে তুলিয়া বলিল, 'তুমি পায়ের ধূলি হবে কেন ধীরা! তুমি হবে আমার হৃদয়লক্ষ্মী, তুমি হবে কল্যাণী জ্যোতিশিখা।'

'না, না, তুমি আদর করো না, তুমি আমায় শাস্তি দিয়ে আপন করে নাও।'

নিরুপম অনেকক্ষণ ধীরাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, পরে তাহাকে একটী সোফায় বসাইয়া দিয়া বলিল, 'সত্য, শিব ও সুন্দরকে আমরা যেন আমাদের গভীর মর্ম্মকোষে অনুভব করে সার্থক হয়ে উঠি—প্রেমে ও বিশ্বাসে যেন আমরা জীবনকে প্রাত্যহিকতার বিবর্ণতা থেকে মধুময় করে তুলি।'

ধীরা হয়ত তাহার কথা শুনিতেছিল না। তাহার দৃষ্টি জানালার ফাঁকে বহুদূরে চলিয়া যায় সেই পুরাতন পরিচিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাহার পরে বাড়ী, তাহার ফাঁকে নীল আকাশ, আকাশের ধূসর রঙ তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে।

সহসা যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল, 'বনজ্যোৎস্নায় ফুল ফুটেছে?'

নিরুপম কৌতুক ও উল্লাসে তৃপ্ত হইয়া বলিল, 'ফুটেছে, চমৎকার ফুল হয়েছে।'

ধীরা উত্তর দিল না। তাহার মুখে নবতর লাবণ্য খেলিয়া গেল। সে আজ অমৃতরূপিণী জননী। আনন্দের স্রোতে তাহার সমস্ত অতীত প্লাবিত হইয়া গেল। সে যেন অমৃতস্নাত হইয়া উঠিল। তাহার সম্মুখে দীপ্ত ভবিষ্যৎ-আশার অরুণচ্ছটা—পুলকের কুলপ্লাবী প্লাবন।

সমাপ্ত

এই লেখকের লেখা বই

১ ।	জীবনের চলস্রোত—উপন্যাস		...	২৲
২ ।	শিশু মনের চলচ্চিত্র	ঐ	...	১৲
৩ ।	মনীষা	ঐ	...	১৲
৪ ।	সহচরী	ঐ	...	২৲
৫ ।	ডাকবাংলো	ঐ	...	১॥০
৬ ।	বন্ধন ও মুক্তি	ঐ	...	২৲
৭ ।	চার্ব্বাক	নাটক	...	॥০
৮ ।	চিরন্তণী	ঐ	...	॥০
৯ ।	নব্যা ও সবিতা	ঐ	...	১।০
০ ।	মহানিষ্ক্রমণ	ঐ	...	১৲
১ ।	একলব্য	ঐ	...	॥০
২ ।	দীপশিখা	কাব্য	...	॥০
৩ ।	বিরহ স্তবক	ঐ	...	॥০
৪ ।	গীতা স্মৃতি	ঐ	...	॥০
৫ ।	বিদ্যুৎশিখা	গল্প গ্রন্থ	...	॥০
৬ ।	পত্নীব্রত	ঐ	...	১।০
৭ ।	Bankim Chandra his Life and Art			Rs. 2-8

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।